বেণী রায়।

বেণী রায়

(উপন্যাস)

শ্রীসত্যরঞ্জন রায় এম, এ,

প্রণীত।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য পাঁচ সিকা মাত্র।

৬১ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
কুন্তলীন প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত
ও
২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ভূমিকা।

বেণী রায় রাজা দেবীদাসের সমসাময়িক। গৌড় বাদশাহ দাউদ শাহের সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহার প্রবল প্রতাপ ছিল। কুলশাস্ত্রে আছে,—

"গঙ্গাপথের গঙ্গাধর, কৈতের বেণী,
ছাতকের বসন্ত রায়, পঁউলির ভবানী।"

এই উপন্যাসে বর্ণিত মূল উপাখ্যান কিম্বদন্তী হইতে গৃহীত। কিন্তু ইহাতে যে সকল ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই কাল্পনিক। ভানু সিংহের সহিত বেণী রায়ের যুদ্ধ ইতিহাসের কথা।

প্রথম খণ্ড

মেঘ—তমিস্রা

বেণী রায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আকাশে মেঘমালা। মেঘের কোলে বিজলীর খেলা। মেঘ গর্জ্জিতেছে, বর্ষিতেছে; বিদ্যুৎ চমকিতেছে, দহিতেছে;—অন্ধকারময়ী রজনীর ভীষণতা আরও বাড়িতেছে। ক্ষুব্ধ মথিত চক্রবালরেখাবিলীন চলনহ্রদের দিগন্তপ্রসারিত অম্বুরাশি জলদমন্দ্রে গর্জ্জিতেছে, ছুটিতেছে, কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত হইতেছে,—যেন কালিন্দীর জলকল্লোল ভেদ করিয়া সহস্র কালিয় নাগ রোষে শ্বসিয়া উঠিতেছে। আবর্ত্তের পর আবর্ত্তের অভিঘাতে চলনের তটদেশবর্ত্তী মহাশ্মশান বিধ্বস্ত। সেই মহাশ্মশানে ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ উপেক্ষা করিয়া একটি ব্রাহ্মণযুবক ভগ্নপ্রাণে উন্মত্তের ন্যায় পাদচারণ করিতে করিতে বলিতেছিলেন,—

"ঐ যে হ্রদ চলন, উহার বক্ষ কখনও স্থির, ধীর, প্রশান্ত,—কখনও চঞ্চল, ফেনিল, তরঙ্গময়। মানুষের হৃদয়ও সেইরূপ। আজ গভীর শান্তি, কাল অপরিমেয় চাঞ্চল্য,—প্রকৃতির ন্যায় নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। আমার চিত্তের কাছে চলনের আলোড়ন? হৃদয়বেলাবিদারী শোকোচ্ছ্বাসে আমি দীর্ণপ্রাণ, জর্জ্জরিত। নিয়তির খরশরে আমি ক্ষতবিক্ষত। এ ক্ষতের প্রলেপ নাই, এ দুঃখের

অবধি নাই। শোকে যে শান্তি, দুঃখে যে আশা, সংসারে যে সুখ, ধর্ম্মে যে সঙ্গিনী, ভগ্নহৃদয়ে যে বিশল্যকরণী তাহাকে যখন হারাইয়াছি তখন আর এ জীবনে প্রয়োজন কি? পিপাসায় যে বারি, তুফানে যে কাণ্ডারী, আঁধারে যে আলো, আকাশে যে ইন্দ্রধনু, শরতে যে জ্যোৎস্না, বসন্তে যে মলয়, তাহাকেই যদি না পাইলাম তবে আর বাঁচিয়া কি করিব? জ্ঞানে যে উৎসাহ, কর্ম্মে যে প্রেরণা, শ্রদ্ধায় যে সত্যভামা, প্রণয়ে যে পার্ব্বতী, তাহাকেই হারাইলাম তো বাঁচিয়া থাকি কেন? ভোগে যে সংযম, ভজনায় যে চিত্তশুদ্ধি; বিষয়ে যে অনাসক্তি সেই চলিয়া গেল তো এ প্রাণ রাখিয়া কি লাভ? আদরিণী জয়া আমার আজ দস্যু-কবলে শ্যেনধৃতা কপোতীর মত কত ভীতা, কম্পিতা, বিপন্না। আর আমি এমনি হতভাগ্য যে স্বহস্তে সেই দস্যুর শিরশ্ছেদ করিতে পারিলাম না! কেন তাহাকে ছাড়িয়া গেলাম? কেন গৃহে রহিলাম না? যে পাপিষ্ঠ নরাধম আমার হৃদয়ের ধন এমনি করিয়া কাড়িয়া লইল, জড়িত লতাকে বিটপিবক্ষ হইতে এমনি সবলে ছিন্ন করিল তাহার শোণিত-তর্পণে কেন অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পারিলাম না? শুধু অশ্রুবর্ষণের জন্য কেন বাঁচিয়া রহিলাম?—এস মরণ, এস ঈপ্সিত, চিরবাঞ্ছিত, দীনশরণ, দুঃখহরণ, এস! তোমার অমৃত ক্রোড়ে আমায় চির বিশ্রাম দাও! আর যে সহে না, হৃদয়ের জ্বালা আর যে সহিতে পারি না। জয়া! জয়া! জয়া!”

শোকে মুহ্যমান যুবক চলনহ্রদে ঝাঁপ দিতে গেলেন, পায়ে একটা

শবাস্থি লাগিয়া তাঁহার গতি প্রতিহত হইল। অকস্মাৎ শূন্যে শব্দিত হইল,—হাহা-হাহা-হাঃ! হিহি-হিহি-হাঃ!

যুবকের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি পুনরায় সৈকতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এবার একখণ্ড প্রস্তরে আহত হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। সেই মহাশ্মশানে, উন্মত্ত প্রকৃতির উন্মুক্তবক্ষে তিনি একা, আপনার চিন্তায় আপনি বিভোর, জীবন-বিসর্জ্জনে সমুৎসুক।

ওকি? আবার ও কি শব্দ?—হাহা-হাহা-হাঃ! হিহি-হিহি-হাঃ!

যুবকের নাম বেণীমাধব রায়। তিনি বাল্যকাল হইতেই অকুতোভয়। শ্মশানে শ্রুত অট্টহাস্যে তাঁহার চিন্তাস্রোত ভিন্নমুখী হইল না। তিনি আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "জয়া পাইবার নয়, আমার বাসনাও মিটিবার নয়। এ হৃদয় উষরক্ষেত্রে আশালতা মুঞ্জরিবে না, জীবনসরসিজে সুখশিলীমুখ আর গুঞ্জরিবে না। হায়, মানুষের সুখ!—আলেয়ার আলো, শ্রাবণের রৌদ্র, মরীচিকাবিভ্রম, স্বপ্নের ন্যায় অসার, ক্ষণপ্রভার ন্যায় ক্ষণিক, নলিনীদলস্থ শিশিরবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল! যাহা এত অনিত্য, এত অলীক, তাহা এত প্রেয়, এত রমণীয়! হাস্য লাস্যসমাস্তৃত অপূর্ণ-সুখাশারঞ্জিত সংসার ছায়াবাজি, মায়ামৃগ,—দাহের উপর মোহের আস্তরণ, অন্ধকারের উপর জ্যোৎস্নার আবরণ! এ জগতে সব মিথ্যা, দুঃখই সত্য। এ জগতে যাহা চাই তাহা পাই না, সার কিছুই নাই। আছে নৈরাশ্যের তপ্তশ্বাস, অদৃষ্টের উপহাস।

আছে অন্যায়ের উপর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা, ভাণের উপর আন্তরিকতার আচ্ছাদন, পুণ্যের নামে পাপের প্রসার, কান্নার উপর হাসির মুখোষ, শক্তিমত্তার উপর শঠতা ও যথেচ্ছচারিতার ভিত্তি। ইহ-জগতে শান্তি?—পর্ণকুটীরে রত্ন, অমানিশায় কৌমুদী, শৈশবে পূর্ণতা, সম সম্ভব হইতে পারে, অসম্ভব পৃথিবীতে শান্তির চন্দ্রালোক। এই অনিত্যধাম যদি শান্তির নন্দনই না হইল, তবে অনন্ত জ্বালা সহিবার জন্য এখানে থাকিতে চাহিবে কে?—জগৎ, বিদায়! সংসার, বিদায়! আমি চলিলাম, সেই চিরশান্তিনিকেতনে চলিলাম, যেখানে প্রেম আছে, কিন্তু প্রেমের মরণ নাই,—সুখ আছে. কিন্তু সুখের বিনাশ নাই,—আনন্দ আছে, কিন্তু আনন্দের অন্ত নাই। জয়া, ইহলোকে তোমাকে আর পাইব না। কিন্তু সেই জীবনের পরপারে অনন্তের যাত্রী আমি আবার তোমায় পাইব, পাইয়া হারাইব না। একদিন তুমিও সেখানে আসিবে। তখন অনন্ত প্রেমের অনন্ত সুখ উভয়ে অনন্তকাল ধরিয়া ভোগ করিব, অনন্ত মিলনে অন্তরের জ্বালা জুড়াইব।"

শ্মশানচারী যুবক এবার স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, লহরের পর লহর তুলিয়া সুকণ্ঠে কে যেন গায়িতেছে,—

"নিবিড় আঁধারে মা, চমকে ও রূপরাশি!"

প্রেতভূমিতে মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীত! গায়ক গায়িতে লাগি-লেন,—

"নিবিড় আঁধারে মা, চমকে ও রূপরাশি,
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসী!"

একি সঙ্গীত?—না, সুপ্ত অন্তর্বিকাশকর স্বরূপপ্রকাশক দৈববাণী?

যুবকের গতি সহসা রুদ্ধ হইল। তাহাকে যাদু করিল কে? ওকি বেণী, মরিবে না? সঙ্কল্প সাধন করিবে না? অগ্রসর হও, অগ্রসর হও!

ঐ আবার কি? শ্মশানচারী যুবক ও কি দেখিলেন? ঘনান্ধকারে ও কার মূর্ত্তি সহসা তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া দিল—অনন্ত-জ্যোতিঃস্বরূপিনী অনন্তশক্তিশালিনী উন্মাদিনী উলঙ্গিনী শ্যামা অসিখর্পরহস্তে কঙ্কালমালিনীরূপে শূন্যে আবির্ভূতা! কিবা জ্বল জ্বল অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ। বেণী চক্ষু মুদিলেন। তাঁহার সংজ্ঞা আছে কি নাই! তিনি আকুলকণ্ঠে কেবল "মা!" "মা!" বলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তার পর যেন অচিরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া কহিলেন, "মা! মা! এ কি মূর্ত্তি দেখাইলি মা! আমার মরা যে হইল না। এ তোর কোন্ খেলা মা!"

আবার সেই কণ্ঠ! আবার সেই সঙ্গীত! সুরতরঙ্গ লুটিয়া লুটিয়া তাঁহার কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিল। পরক্ষণেই পুনরায় সেই বিকট অট্টহাস্য শ্রুতিগোচর হইল,—হাহা-হাহা-হাঃ! হিহি-হিহি-হাঃ!

বেণীমাধব এবার দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তাই হবে মা! তোরই কাজ করিব মা!—ও কিঁ, কোথা যাস্, কোথায় লুকাস্ মা? দেখা, দেখা, আবার তোর ঐ অলোকসামান্যামূর্ত্তি দেখা মা! প্রাণে উৎসাহ, হৃদয়ে সঙ্কল্প জাগা মা, জাগা মা! আঁধারে

আলোক, মেঘে চপলা, সান্তে অনন্ত, ভূমার বিকাশ দেখা মা, দেখা মা!”

যুবক উন্মত্তের ন্যায় সেই চলনের, মহাশ্মশানে গায়কের অনুসন্ধান করিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অথচ দূরে, অতি দূরে আবার সেই অপূর্ব্বকণ্ঠে অপূর্ব্ব সঙ্গীত শ্রুত হইল,—

“নিবিড় আঁধারে মা, চমকে ও রূপরাশি!”

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বেণীমাধব কিরূপে পত্নীহারা হইলেন নিম্নে তাহা বিবৃত হইল।

সর্দ্দার জলিল কামালপুরের ধনাঢ্য, উচ্চবংশোদ্ভূত, দুশ্চরিত্র যুবক। সে নগদ বহু আস্‌রফির মালিক, জায়গীরদার, গৌড়-বাদশাহের জনৈক অমাত্যের জামাতা। নিয়ত 'ইয়ার'পরিবৃত হইয়া নীচ বিলাস আমোদে রত রহিতেই অধিক ভালবাসিত। তাই যখন দাউদ শাহের সহিত আকবর বাদশাহের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল, তখন সে সঙ্গী, সুরা ও নর্ত্তকীর সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়া গোলাগুলির সাহচর্য্য পিপাসী হইল না।

এমন সময়ে একদিন বন্ধু খলিল তাহাকে বলিল, "দোস্ত, শুনেছ কাছিকাটার বামুনপণ্ডিত বেণীরায়ের একটি পরমা সুন্দরী স্ত্রী আছে? তাহার বয়স উনিশ কি বিশ। সে রূপে যেন ডানাকাটা পরী, বেহিস্ত ছেড়ে ভু'লে বামুনটার কুঁড়েয় উদয় হয়েছে। তার দিকে একবার চাইলে চোখ ফেরান যায় না। আহা, সে যৌবনের পূর্ণতায় যেন ভাদ্র মাসের কূলে কূলে ভরা পদ্মা! কি রংএর বাহার, যেন দুধে আল্‌তায় মেশামেশি! কি চলনের বাহার, যেন রাজহংসীর দর্পনাশী! কি ধনুর মত বাঁকা বাঁকা ভুরু! কি পাগলকরা ঢল ঢল পটোলচেরা চোখের চাহনি! কি মখমলের মত মোলায়েম গোলাপ-রাঙ্গা গাল দুটি! কি টুক্‌টুকে লাল কলির মত ঠোঁট দুখানি! জলিল, বলিব কত, তুমি একবার যদি সে রূপ দেখিতে! মামুর বাড়ীতে যাইবার সময় আমি একবার তা'কে

দেখেছি। দেখে কতবার মনে করেছি, এ ফুলটি বামুনের কুটীরে ফু'টে নষ্ট হয় কেন, দোস্তের জন্য তু'লে আনি। জহুরী রত্নের কদর বুঝে। তারই কাছে এমন মাণিক থাকিলে মানায়।"

জলিল অবাক্ হইয়া বন্ধুর কথা শুনিতেছিল। খলিলের কথা সাঙ্গ হইলে সে বলিল, "একটা বামুনপণ্ডিতের ঘরে এমন মাণিক! দোস্ত, বল কি?"

খলিল। বিশ্বাস না হয়, একদিন চক্ষু কর্ণের বিবাদ মিটাও।

জলিল। বেশ, তাই হবে। কালই আমরা পরীকে দেখিতে যাব।

জলিল এ সব ব্যাপারে কোনকালেই পশ্চাৎপদ নয়। বিশেষ, এত রূপের আধার যে তাহাকে না দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত রহিবে?

পরদিন অপরাহ্নে বেণীমাধবের পত্নী জয়া পুষ্করিণীর ঘাট হইতে গা ধুইয়া অন্তঃপুরের অভিমুখে যাইতেছিলেন। জলিল তাঁহাকে আর্দ্রবসনে কলসীকক্ষে মন্থরগমনে যাইতে দেখিল। সেই দেখাই তাহার কাল হইল। সদ্যঃস্নাতার অবয়বে যে অনন্ত মাধুরী ফুটিয়া উঠে সুন্দরী রমণীতে তাহা সহস্রগুণে রমণীয়। সে সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিও ক্ষণেকের জন্য আত্মহারা হন, বিধাতার অপূর্ব্বসৃষ্টি জ্ঞানে তাহা হইতে বিস্ময়োৎফুল্লদৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারেন না। জলিলের কথা কি বলিব? সে যাহা দেখিল তাহা কল্পনার অতীত সুষমা, স্বপ্নের অগোচর শোভা। মরি মরি কি অপরূপ রূপলহরী! যেন সদ্যঃশিশিরসিক্তা বসোরার গোলাপ মৃদুমন্দ বায়ুভরে হেলিতেছে, দুলিতেছে, আপনার গৌরবে আপনি

ঢলিয়া পড়িতেছে! যেন হিরণ্ময়ী লতা মলয়ানিলে দুলিয়া দুলিয়া রূপের ঢেউ তুলিয়া যাইতেছে! কিবা চকিতহরিণীবৎ দৃষ্টি, কিবা স্তবকভার নম্র অশোকের মত লজ্জাবনতাঙ্গ! কিবা সুকোমল নববল্লরীবৎ মাধুরী! কিবা ললিতলাবণ্যলসিতা তন্বীর লীলায়িত কলেবরদীপ্তি! কিবা কষিতকাঞ্চনলাঞ্ছিত দ্যুলোকভূলোকবাঞ্ছিত অনিন্দ্যসুন্দর জ্যোতির্ম্ময়ী মোহিনী মূর্ত্তি! মরি মরি কি অপরূপ রূপলহরী! যে রূপের সম্মুখে বাচাল মূক হয়, মূক বাচাল হয়; যাহা দেখিলে শিষ্টের চক্ষু সম্ভ্রমে নত হয়, দুষ্টের নয়নে লালসার বহ্নি প্রদীপ্ত হয়; যাহা দেখিলে মানুষ মানুষীকে দেবীজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে, পিশাচ অপ্সরাবোধে ভোগাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হয়, ইহা সেই রূপ। যে রূপ আপনাকে আপনি লুকাইয়া রাখে, অপরে দেখিলে সঙ্কুচিত হয়; যাহাতে লোলকটাক্ষ নাই, দৃষ্টি ভূমিসম্বদ্ধ; যাহাতে বিলাসের পারিপাট্য নাই, ত্যাগের সংযমচ্ছটা প্রতিভাত; যাহা যৌবনের আবেগোত্তেজনায় চঞ্চল নয়, ফল্গুধারার ন্যায় নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত, ইহা সেই রূপ। যে রূপের ভাষার কাছে জগতের সকল ভাষা, সকল ছন্দ স্তব্ধ হয়, যাহার নীরবসঙ্গীতে কলকণ্ঠের কোমল কূজন, বীণার ঝঙ্কার, রাগরাগিণী কর্কশ বোধ হয় ইহা সেই রূপ। রূপের আবার ভাষা? রূপের আবার সঙ্গীত? যে তাহা বুঝে নাই, যে তাহা শুনে নাই, সে অতি দীন, নয়ন থাকিতে অন্ধ।

জলিল এইরূপ অপরূপ রূপ দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইল, তাহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে তাড়িতপ্রবাহ ছুটিল, তাহার চক্ষুর

সম্মুখে আকাশভূমিকুটীরবিটপিতটবাপী সব ঘুরিতে লাগিল। সে ঐ অলোকসামান্যা সুন্দরীর প্রতি গতিবিভ্রমে, অঞ্চলসঞ্চালনে, অলঙ্কারশিঞ্জিতে ঐক্যতানবাদনের ন্যায় অশ্রুতপূর্ব্ব সঙ্গীত শুনিতে পাইল ও বেণুরবে ধাবিত মৃগের ন্যায় বিমূঢ় হইল। জয়া চলিয়া গেলেও সে সেদিক হইতে তাহার লালসালোলুপ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিল না। রমণীদুর্লভ রূপের অয়স্কান্তে তাহার চক্ষু দুইটি এমনি আকৃষ্ট হইয়া রহিল। সহসাশ্রুত পত্রমর্ম্মরে ও অনিশ্চিত অস্ফুট কণ্ঠস্বরে সে যেন কাহার কলধ্বনি শুনিতে পাইয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। কাহার শ্বাসের সৌরভ বহিয়া আনিয়া সমীরণ যেন মর্ত্ত্যকে স্বর্গে পরিণত করিয়া তুলিল। সে আসিতেছে কি? সে আসিতেছে কি? যাহার রূপের রশ্মিস্পর্শে তাহার হৃদয়তন্ত্রী আজ বাজিয়া উঠিয়াছে সে তাহার অঙ্কলক্ষ্মী হইবে কি?—কই, সে তো আর আসিল না, জগৎ আর হাসিল না,—একি স্বপ্ন না সত্য?

সত্য সত্যই জলিল অচিন্তনীয় রূপরাশি দেখিয়া পাগল হইল। তাহার দৃষ্টি স্থির, বেণীমাধবের অন্তঃপুরাভিমুখী; তাহার বাক্য রুদ্ধ। সে বজ্রাহতের মত, চিত্রার্পিতের মত সেই বাপীতটে দাঁড়াইয়া রহিল। খলিল কত বলিল, কত বুঝাইল, তবু সে প্রবোধ মানিল না।

খলিল বড় মুস্কিলে পড়িল। সে কহিল, "এভাবে এখানে দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিলে লোকে বলিবে কি? পাগল হইলেই তো আশার সুসার হইবে না, বরং উদ্দেশ্য পণ্ড হইবে।" জলিল তবুও নির্ব্বাক্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অবশেষে অনেক বলা কহার পর হতভাগ্য উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় খলিলের দিকে চাহিল। খলিল বলিল, "হৃদয়ের চাঞ্চল্য দমন কর। ছি, এত এত অধীর হইলে চলে কি ?"

চন্দ্রের আকর্ষণে সাগরের বক্ষ স্ফীত হইয়া কূল প্লাবিত করে। প্রেমিকের হৃদয়ও সেইরূপ প্রণয়প্রতিমার দর্শনে চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন তাহার ইন্দ্রিয়গণ স্তব্ধ হয়, প্রাণ আকুল হয়। সুতরাং জলিল বন্ধুর কোন কথা শুনিতে পাইল না। অগত্যা খলিল তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল। হতভাগ্য সর্দ্দারের চরণ গমনে কুণ্ঠিত, তবু তাহাকে যাইতে হইল। যাইতে যাইতেও সে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া কাহার সন্ধানে সঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না।

এই ভাবে দুই বন্ধু সেই গ্রামের বাহিরে আসিয়া পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কামালপুরে পঁহুছিয়া জলিল কাহারও সহিত বড় কথাবার্ত্তা কহিত না। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে দুই একটা কথার সংক্ষেপে উত্তর দিত। হাসিকৌতুকপ্রিয় দোস্তের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া খলিল চিন্তিত হইল। সে কত বুঝাইল; বলিল, "খোদা মালিক, শীঘ্রই তোমার মনের আশা পূর্ণ হইবে।" জলিল কিছুতেই বুঝ মানিল না। 'ইয়ার'গণ আড্ডা মাটি হইল দেখিয়া অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইল, পাশা পড়িয়া রহিল, নর্ত্তকীরা চলিয়া গেল।

জলিল একা থাকিতে ভালবাসে, অধিক সময় একাই কাটায়। কিয়দ্দিবস এইভাবে কাটিলে একদিন খলিল জনৈক ব্রাহ্মণকে বন্ধুর সম্মুখে হাজির করিয়া কহিল, "দোস্ত, এইবার তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

জলিল এতদিন নির্ব্বাক্ ছিল। আজ খলিলের কথায় সহসা তাহার মুখ ফুটিল। সে বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে কহিল, "বল কি? এ কে?"

খলিল। এই বামুনটাকেই জিজ্ঞাসা কর।

জলিল। তোমার নাম কি?

ব্রাহ্মণ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) আজ্ঞে, শ্রীহৃষীকেশ দেবশর্ম্মা তর্কালঙ্কার।

জলিল। রিষীকেশ তক্কলঙ্কা?

খলিল। না, রিষীকেশ পক্করম্ভা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

জলিল। আচ্ছা, পঙ্করত্তা, তুমি আসিতেছ কোথা হইতে?

হৃষীকেশ শর্ম্মা তখন অতিশয় কাতরস্বরে করজোড়ে কহিল, "দোহাই খাঁ সাহেব, আমার কোন অপরাধ নাই। এই মিঞা সাহেব শুধু শুধু আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন।"

খলিল। চোপ্ রও, বেইমান্!—হাটে কি বলিতেছিলে বল।

হৃষীকেশ। আজ্ঞে, তা' বলিতেছিলাম কি,—হাটে বলিতেছিলাম কি,—সে এমন কিছু নয়, আপনাদের কোন প্রস্তাব নয়—

খলিল। শীঘ্র বল্! নইলে তোর মুখে থুতু দিব।

হৃষীকেশ। আজ্ঞে, হাটের মাঝখানে রাজারাজড়ার কথা না বলাই ছিল ভাল। তা' ঘাট্ হইয়াছে, গরীবের গোস্তাকি মাপ্ হয়, হুজুর!

খলিল। খানসামা, গোস্ত ল্যাও! ল্যাকে ইস্কো খিলা দেও।

হৃষীকেশ প্রমাদ গণিলেন। ব্রাহ্মণের মুখে মুসলমানের থুতু, তার পর, রাম বল, একেবারে গোস্ত! হতভাগ্য তর্কালঙ্কার মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, আর কখনও প্রকাশ্যে পরচর্চ্চা করিবেন না। তিনি নাকে কাণে খৎ দিয়া ক্রন্দনের সুরে কহিলেন, "খাঁ সাহেবরা গরীব বামুনের জাতিটা আর মারিবেন না। যাহা শুনিতে চান বলিয়া যাইতেছি। সাঁতোড়ের রাজা মুকুট রায় বারেন্দ্র কুলীন ও সিদ্ধশ্রোত্রিয় স্ত্রী স্বত্বেও রাঢ়ীয় বংশে বিবাহ করেন। তাহাতে উপাধিশূন্য পণ্ডিত বেণীমাধব রায় মত দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'রাঢ়ী ও বারেন্দ্রে বিবাহ অশাস্ত্র নয়। কেবল দেশাচারই এরূপ বিবাহের একমাত্র প্রতিবন্ধকতা। তা' ব্রাহ্ম-

ণেরাই দেশাচার পরিবর্ত্তন-প্রবর্ত্তনের কর্ত্তা। 'এ ক্ষেত্রে আমরা দেশাচার লঙ্ঘনের ব্যবস্থা দিলাম। সাঁতোড়ের সান্ন্যালবংশীয় রাজা চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা বিবাহ করিবেন ইহা অযুক্তিক নহে। কাশ্যপগোত্রীয় কুলীন বারেন্দ্র হইলে মৈত্র, রাঢ়ী হইলেই চট্টোপাধ্যায়।'

অসহিষ্ণু জলিল ব্রাহ্মণের কথার ভনিতা শুনিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহাকে পয়জারের ঠোকর মারিতে মারিতে কহিল, "সংক্ষেপে বল। বেণীরায়ের কথা বল। অত গোত্র বংশের খবরে আমার কাজ নাই।"

হৃষীকেশ। হুজুর তবে সকল কথা শুনিতে চান না?

জলিল। আচ্ছা, সব বলিয়া যাও।

হৃষীকেশ বলিতে লাগিলেন, "একবার যাই ব্যবস্থা পাওয়া আর যাবে কোথায়? এবার রাজা সমাজকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখাইয়া আর একটি সংস্কার বা ভাঙ্গচুর করিতে বসিয়াছেন, অর্থাৎ একটি বৈদিক বিবাহের ইচ্ছা করিয়াছেন; পণ্ডিতমণ্ডলীর মত চাই। হ'ল সভা, হ'লেন বেণীমাধব আহত (আহূত)—

জলিল। বামুন ঠাকুর কোথায় এখন?—সাঁতোড়ে কি?

হৃষীকেশ। সর্দ্দার সাহেব, ভুল হইতেছে,—বয়োধিক্যতাবশতঃ বড় ভুল হইতেছে। তায় এরূপ বাধা দিলে আমি সব বিস্মরণ হইব।

জলিল। বেশ, বেশ, দ্রুত বলিয়া যাও।

হৃষীকেশ। দ্রুত পারিব না। যেমন বলিতেছি তেমনি বলিয়া

যাইতে দিন। রাজা আগের বারে পাইয়াছিলেন দেশাচারকে পদাঘাত করিবার ব্যবস্থা, এবার করিলেন পণ্ডিতমণ্ডলীকে পদাঘাত! কথাটা এই। যাই হইল পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ অমনি মুকুট রায় বলিয়া বসিলেন, 'রাজা আমি, শাস্ত্র বা দেশাচার প্রবলের পক্ষে পালনীয় নহে। আমার যা খুসী তা করিব। আপনারা ব্যবস্থা দিন বা না দিন ক্ষতি নাই।' এই বলা, আর যাবে কোথায়? বেণী ঠাকুর একেবারে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি একেই অগ্নিশর্ম্মা, তায় রাজার কাছে অপমান। গর্জ্জিয়া প্রত্যুত্তরে কহিলেন, "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা? পণ্ডিত 'মণ্ডলীকে অপমান?—দিলাম না আমরা ব্যবস্থা। করুন দেখি বিবাহ?' ইহা বলিয়াই তিনি সক্রোধে রাজসভা ত্যাগ করিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য পণ্ডিতগণও প্রস্থান করিলেন।

জলিল। তবে কি বেণী ঠাকুর সাঁতোড়ে নাই?

হৃষীকেশ। আজ্ঞে আবার ভুল হইতেছে, বিস্মরণ হইতেছি। হাঁ, হাঁ, কি বলিতেছিলাম, মিঞা সাহেব?

খলিল। বলিতেছিলে, বেণী সভা ত্যাগ করিল।

হৃষীকেশ। হাঁ,—তারপর রাজার সভাপণ্ডিত শ্রীরাম শাস্ত্রী দেখিলেন, মহা অনুপায়। তিনি রাজাকে বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ঐ একগুঁয়ে উদ্ধত ব্রাহ্মণকে হাত না করিলে তো কোন উপায় দেখিতেছি না।' রাজা বলিলেন, 'আমি রাজা হইয়া একটা উপাধিহীন বামুন পণ্ডিতকে খোসামোদ করিব, ঠাকুর মশাই?' শাস্ত্রী মশায় বলিলেন, 'বেণীমাধব যেমন-তেমন

ব্রাহ্মণপণ্ডিত নন। কাশীর পরম পণ্ডিত মাধবাচার্য্যের প্রধান শিষ্য তিনি। এই উপাধিপ্লাবিত বঙ্গদেশে শত সহস্র বাগীশ-ভূষণ-অলঙ্কার-পঞ্চানন-অর্ণব-সাগর-নিধি-রত্ন-চুঞ্চু-শিরোমণি প্রভৃতির মধ্যে বেণী ঠাকুর পণ্ডিতশিরোমণি। তিনি ইচ্ছা করিয়া উপাধি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহাকে ফিরাইয়া না আনিলে পণ্ডিতমণ্ডলীর মত হইবে না।'

জলিল। কি গেরো, উপাধির ফিরিস্ত্‌ দিয়া কি করিব ঠাকুর? বেণী কোথায় আছে তাই বল।

হৃষীকেশ। শ্রীরাম শাস্ত্রী যে উপাধিধারী পণ্ডিতগণের অপমানসূচক কথা বলিলেন তাহা দেখিতেছেন না। ঐ হতভাগা নিরুপাধি পণ্ডিতটাকেই আপনাদেরও দরকার দেখিতেছি, খাঁ সাহেব!

জলিল। হাঁ, হাঁ,—সে কোথায় বল!

হৃষীকেশ। আজও সাঁতোড়ে কুটুম্ববাড়ীতে আছে। কাল বাড়ী আসিবে শুনিতেছি।

উল্লাসে জলিল ব্রাহ্মণের সম্মুখে একটা আস্‌রফি ফেলিয়া দিল। ব্রাহ্মণ সেই স্বর্ণমুদ্রা কুড়াইয়া লইয়া পাঠান যুবকদ্বয়কে বহুৎ বহুৎ সেলাম করিয়া চলিয়া গেলেন। 'অখণ্ড মণ্ডলাকারং মুদ্রারূপং মনোহরং' দর্শন করিয়া তর্কালঙ্কার অপমানের জ্বালা ভুলিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বাড়ীতে আসিলেন। তিনি দেখিলেন, পরচর্চ্চায় লাভও মন্দ নয়।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলে খলিল বলিল, "কেমন দোস্ত, বলি

নাই খোদা মালিক, কিছু ভাবিও না, শীঘ্রই একটা সুবিধা হইবে ?”

জলিল। ভাই, তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করিতে পারিব না। এখন উপায় কি তাই বল। ছিনাইয়া আনা ভাল কি ?

খলিল। তাহাতে অসুবিধা আছে। জানাজানি হবে। কাছিকাটার হিন্দুরা আমাদিগকে বাধা দিবে, ধরিয়া লইয়া গেলেও গ্রামশুদ্ধ লোক পিছু লইবে। শিকার লইয়া বাড়ী পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারিব কি না তাই বা কে বলিতে পারে ? ইহা ছাড়া, ফৌজদার, সর্দ্দার জম্‌সেদ খাঁ আমাদের হিন্দুর চেয়েও বড় দুষ্‌মন। সে বড় জিদি লোক। প্রকাশ্যে স্ত্রীলোক ধরিয়া লইয়া গেলে আমাদের কিছুতেই ছাড়িবে না, একেবারে গারদে পূরিবে।

জলিল। তবে কি করিতে বল ?

খলিল। বলি, আজই রাত্রি তৃতীয় প্রহরে গোপনে আওরৎ-টাকে বাঁধিয়া আনিতে। কেউ টের পাবে না, কোন গোল হবে না। ফৌজদার যদি পরে সন্দেহও করে, তবে কেবল সন্দেহে একজন উজিরের জামাইকে শাস্তি দিতে পারিবে না। আমরা বেণী রায়ের জরুকে যেমন গোপনে ধরিয়া আনিব তেমনি লুকাইয়া রাখিব। কোন গোলমালের ভিতর যাব না। তবে, বুঝেছ, বাছা বাছা জন কতক সঙ্গী নিয়ে সশস্ত্র হ’য়ে যেতে হবে। কি জানি, কখন কি হয়, বিপদের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া দরকার।

সেই রাত্রেই দুর্বৃত্তেরা কাছিকাটায় রওনা হইল। মূর্ত্তিমান্ পাপ পুণ্যকে পরাভব করিতে গেল, রাহু চন্দ্রকে গ্রাস করিতে

চলিল। মানবজাতির ইতিহাসে এই দেবাসুরের সংগ্রাম আবহমান-কালের—এই সংঘর্ষের ফলেই পুণ্যের পবিত্র রশ্মি শতধা বিকীর্ণ হইয়া থাকে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

জয়া শয়নকক্ষে নিদ্রাভিভূতা। সিঁধ কাটিয়া জলিল ও তাহার অনুচরেরা নিঃশব্দপদসঞ্চারে সেস্থানে প্রবেশ করিল। পিল্‌সুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। উহার আলোকে অলোকসামান্যা যুবতীর স্বভাবসুন্দর মুখখানি আরও সুন্দর, আরও দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। জলিল একদৃষ্টে সেই অপূর্ব্ব শ্রী দেখিতে লাগিল এবং উহাতে অসংখ্য সুষমা সপ্রকাশ দেখিয়া হতবুদ্ধির মত নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। আহা, কিবা চারুতায় পূর্ণতায় ঢল ঢল সেই মুখখানি! তাহার উপর ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাগুচ্ছ। যেন পূর্ণিমার শশী মেঘে ঢাকিয়াছে! একটি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পদ্ম বুঝি সরসীর কালো জলে ভাসিতেছে! অঙ্গে স্বল্পাভরণ, দিবসে দীপালোকের ন্যায় দেহলাবণ্যের সংস্পর্শে হীনপ্রভ। কিবা উজ্জ্বলে মধুরে মেশামেশি! কিন্তু স্বচ্ছতোয়া বাপীবক্ষে প্রতিবিম্বিত জলধরচ্ছায়াসম্পাতের ন্যায় সেই সুন্দর মুখমণ্ডল যেন কিঞ্চিৎ ম্লান, বুঝি বিরহমেঘে মলিন!

জলিল আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ঐ রূপের অমৃতহ্রদে মরালের ন্যায় সন্তরণ করিতে অধীর হইল, তরুণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয়ের দাবদাহ জুড়াইতে উদ্যত হইল। বিকচকুসুমের পার্শ্বে কোরকের মত তরুণীর পার্শ্বে তাঁহার একমাত্র কন্যা বিমলা নিদ্রিতা ছিল। জলিল তাহার সঙ্গীকে কহিল,

"বালিকার মুখ বাঁধিয়া বাহিরে লইয়া যাও।" এমন সময়ে মেঝের উপর নিদ্রিতা দাসী সহসা জাগিয়া উঠিল। সে চীৎকার করিয়া উঠিতেই খলিল তাহাকে "চুপ রহো, হারামজাদি!" বলিয়া তাহার মুখ হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। গোলযোগে জয়ার নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র তাঁহার নয়নাভিরাম লোচনযুগল সহসা রোষপ্রদীপ্ত হইল ও তাহা হইতে যুবতীসুলভ সলজ্জদৃষ্টির পরিবর্ত্তে অগ্নিকণা বর্ষিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে জলিল তাহার চুম্বনলোলুপ অধর জয়ার অধরের সমীপবর্ত্তী করিতেই তেজোদৃপ্তা রমণী "সাবধান, দুরাচার!" বলিয়া গর্জ্জিয়া উঠিলেন ও দেখিতে না দেখিতে সেই দুর্ব্বৃত্ত পাঠানের গণ্ডে সজোরে এক ঘুষা মারিলেন। মোহান্ধ জলিল বঙ্গললনার প্রেমে গদগদ ললিত স্বর দীপকে পরিণত হইতে দেখিয়াও স্তম্ভিত হয় নাই, এখন তাহার জড়িতলতার ন্যায় কোমলহস্ত বজ্রের ন্যায় শক্তিধর দেখিয়া বুঝিতে পারিল, এই রমণীগণ যেমন কুসুমসুকুমার তেমনি সাহসে ভৈরবী, তেজে সৌদামিনী, কঠিনে কোমলে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই বঙ্গললনা। খলিল হাসিয়া কহিল, "দোস্ত, দেখিতেছ কি? এই তেজস্বিনী রমণী তোমারই মত সর্দ্দারের উপযুক্ত প্রণয়িনী!" ঘুষাটায় জলিলের মাথা বিলক্ষণ ঘুরিতেছিল। সে রসিকতা না করিয়া অনুচরদিগকে আদেশ করিল, "এই সেয়ানীকে বাঁধিয়া লইয়া চল।"

দুর্ব্বৃত্তেরা জয়াকে লইয়া চলিয়া গেল। দাসীর মুখ বাঁধা ছিল। সে চেঁচাইতে পারিল না। বহির্ব্বাটীতে একটি বৃদ্ধ ভৃত্য স্বপ্নশ্রুত

মনুষ্যের দ্রুত পদশব্দে জাগিয়া উঠিয়া দুই একবার "কে ?—কে ?" বলিয়া হাঁক দিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল। চতুঃস্পাঠীর নিদ্রামগ্ন শিষ্যেরা বুঝিতে পারিল না তাহাদের কি সর্ব্বনাশ হইয়া গেল।

পাষণ্ডেরা ঘুরিয়া ফিরিয়া বড়লের সোঁতার ধারে উপস্থিত হইল ও জয়াকে একখানি ছিপে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ কামালপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

এই ভাবে তাহারা যাইতে যাইতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন আর এক খানি বৃহত্তর ছিপ তাহাদের সম্মুখীন হইলে জলিল সভয়ে দেখিল তাহার আরোহী সেরপুরনিবাসী যুগলকিশোর সান্ন্যাল ও পোতাজিয়ানিবাসী চণ্ডীপ্রসাদ রায়। এই যুবক দ্বয়কে সে ভাল রূপেই চিনিত। দাউদ শাহের রাজত্বকালে রাষ্ট্র বিপ্লবের সূচনা হইতেই ইহারা দলবদ্ধ হইয়া স্বজাতীয়ের মানসম্ভ্রম বাঁচাইবার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং স্থলপথে ও জলপথে অত্যাচার দমন করিয়া বেড়াইত।

জলিলকে দেখিয়াই যুগল কহিলেন, "খাঁ সাহেব, এই প্রত্যূষে কি মনে করিয়া এত তাড়াতাড়ি সদলবলে ছিপ্ চালাইয়া যাইতেছ ?"

জলিল যেন তাহা শুনিতে না পাইয়া এ কথার কোন উত্তর না দিয়া অনুচরদিগকে ক্ষিপ্রবেগে ছিপ্ চালাইতে ইঙ্গিত করিল। তাহা দেখিয়া যুগল হাঁকিলেন, "ছিপ্ ভিড়াও।" ইতিমধ্যে বড় ছিপখানি ছোট ছিপের গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইল। যুগল কহিলেন, "এত ব্যস্ততা কেন খাঁ সাহেব ?"

জলিল। আদাব, আপনাকে এতক্ষণ দেখিতেই পাই নাই। হাঁ-হাঁ, সত্যই বড় ব্যস্ত আছি। ক'দিন বাড়ী ছিলাম না। সেখানকার খবর ভাল নয় শুনিয়া শীঘ্র, শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছি।

যুগল। আসিতেছ কোথা হইতে?

জলিল। মিঞাপুরে কুটুম্ববাড়ীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া ফিরিতেছি।

যুগল। বেশ, বেশ। এখন পূর্ব্ব স্বভাব বদলাইয়াছে তো?

জলিল। তা' আর বলিতে? যে পথে অধর্ম্মের গতি, যাহাতে খোদা নারাজ, এমন পথে জলিল আর যায় না।

যুগল। ভাল, ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। তবে যদি আপত্তি না থাকে, খাঁ সাহেবদের ছিপ্‌খানা একবার দেখিয়া লই।

জলিল। হাঁ—তা'—

খলিল। তাহাতে আমার আপত্তি আছে। সঙ্গে আমার জরু আছেন। তিনি কামালপুরে নামিয়া গেলে আপনারা স্বচ্ছন্দে ছিপ্ দেখিতে পারেন।

জলিল। দোস্ত ঠিক্ বলিয়াছ। আমিও ঐ কথাই বলিব ভাবিতেছিলাম। তা' সান্ন্যাল মহাশয় যখন ইচ্ছা সব দেখিতে পারেন। কেবল জেনানার ইজ্জতের জন্য এখন ছিপে আসিতে দিতে পারিব না।

যুগল। ছিপে খলিলের জরু আছেন কি কোন বন্দিনী আছেন তাহার নিশ্চয়তা কি?

জলিল। তোবা, তোবা, বলেন কি? খলিলের হচ্ছে জরু—

খলিল। আমার হচ্ছে জরু, এও কি একটা প্রমাণের কথা? বিশ্বাস না হয়, এই তো এতগুলি লোক আছে ইহাদের জিজ্ঞাসা করুন। ছি ছি, বড় সরমের কথা, বড় লজ্জায় ফেলিলেন আমাকে। হায় হায়, বেরাদারদের সাম্‌নে আমার মান ইজ্জত সব গেল।

যুগল। চণ্ডী, হারু, তোমরা ঐ ছিপের উপর উঠিয়া ব'স। ক্ষুদিরাম, আমাদের ছিপ্ উহাদের সঙ্গে সঙ্গে চালাইয়া লও।

সর্ব্বনাশ, মহা বেগতিক। এখন একটা গোল করিলে নৌকা ডুবি ও রক্তারক্তি হয়। তার চেয়ে কামালপুরে গিয়া একটা হেস্ত নেস্ত যাহা হয় করা যাইবে। বিশেষ, এখান হইতে কামাল-পুর বেশী দূরও নয়। সেখানে নিজের জোরও চলিতে পারে। ইহা ভাবিয়া জলিল আর কোন আপত্তি করিল না। দুই খানি ছিপ্ পাশাপাশি চলিল।

অবশেষে কামালপুরের সদর ঘাটে পঁহুছিয়া যুগলকিশোর জলিলকে কহিলেন, "তোমার চারিজন লোক ঐ গাছতলায় কাপড়ের বেড় দিয়া ঘের করিয়া দাঁড়াক্। খলিল মিঞার জরু ঐ খানে হাঁটিয়া যাইবেন। সত্য সত্যই ছিপের ভিতরকার আওরৎ যে তাহারই জেনানা ইহা জানিতে পারিলেই আমরা নিশ্চিন্ত মনে ফিরিয়া যাইতে পারি।"

খলিল। তা হবে না, আমার জরুকে আপনাদের সম্মুখে হাঁটাইয়া লইতে পারিব না। পাল্কী আসুক, বেহারারা আসুক, দাস দাসী আসুক, তবে তিনি ছিপ্ হইতে নামিবেন্।

যুগল। আর কোন বাহানা শুনিব না। যাহা বলিলাম এখনই সেইরূপ কর। নহিলে আমরা জোর করিয়া সন্ধান লইব।

জলিল খলিলের সহিত এক পরামর্শ আঁটিল ও প্রকাশ্যে যুগলকে কহিল, "সান্ন্যাল মহাশয়, আমি দোস্তকে সম্‌ঝাইয়া দিয়াছি। আপনার সন্দেহ মিটাইতেছি।"

খলিল গিয়া বন্দিনীর হস্তপদের বন্ধন মোচন করিল। কেবল মুখ বাঁধা রহিল। মুখের উপর একটা বড় ঘোমটা টানিয়া দিয়া সে তাঁহাকে সম্মুক্ষে লইয়া ছিপ্ হইতে বাহির হইল। বলা বাহুল্য, পিশাচ তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিল যে, যদি তিনি পথে কোনরূপ বেয়াদবি করেন তবে সে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলিবে।

কিন্তু রমণী অবতরণ করিয়া বৃক্ষাভিমুখে না গিয়া সহসা যুগল কিশোরের ছিপের সম্মুখীন হইলেন। তাহা দেখিয়া যুগল তাঁহার সঙ্গীদিগকে কহিলেন, "ইঁহাকে ঘিরিয়া ফেল।"

তৎক্ষণাৎ ভয়ানক কোলাহল পড়িয়া গেল। উভয় পক্ষে হাতাহাতি ও লাঠালাঠি আরম্ভ হইল এবং ক্রমে বর্ষা সড়কি তলোয়ার লইয়া একটা খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এত বড় শিকার সহজে ছাড়া যায় না। কিন্তু যুগলের সঙ্গীরা সংখ্যায় অধিক, তাহাদের লাঠিখেলা ও তরবারি প্রভৃতি চালনায় নিপুণতাও বেশী। সর্দ্দারের পক্ষে দুই একটা ঘাল্ হইতেই জলিল ও খলিল অনুচরদিগের সহিত প্রাণভয়ে চম্পট দিল।

জলিল পাঠান, অতএব সর্দ্দার। জয়াকে পাইবার জন্য তাহার আগ্রহও অসামান্য। তবে সে পলায়ন করিল কেন? হয় সুন্দরীকে লাভ, নয় সেজন্য প্রাণত্যাগ, ইহার একটা কিছু তাহার করা উচিত ছিল, অনেক পাঠক এইরূপ বলিতে পারেন। কিন্তু যে স্বজাতির রাজত্বলোপাশঙ্কা বর্ত্তমানেও এবং বাদশাহ দাউদ শাহের ঊর্দ্ধশ্বাসসন্দর্শনেও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে সে বীর নয়। বিশেষ, বীর নারীনিগ্রহ করে না, লম্পট কাপুরুষ। জলিল বীরের ন্যায় প্রাণ দিতে যাইবে কেন? বরং বাঁচিয়া থাকিলে সে জয়ার পরিবর্ত্তে আর কোন সুন্দরী যুবতীকে অপহরণ করিতে পারিবে। তাই জলিল প্রাণটাই আগে বাঁচাইল।

বিপন্নাকে উদ্ধার করিয়া যুগলকিশোর তাঁহার মুখের বন্ধন খুলিয়া দিলেন ও তাঁহাকে বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "আমরা আপনার সন্তান। কোথায় যাইতে ইচ্ছা করেন জানিতে পারিলে আপনাকে সেখানে রাখিয়া আসিতে পারি।"

জয়াও ভাবিতেছিলেন, "এখন কোথায় যাই, কি করি? ইহারা ভদ্র-সন্তান, আমার উদ্ধারকর্ত্তা, ইহাদের সঙ্গে যাইতে অবশ্য কোন বাধা নাই। কিন্তু যাই কোথায়?—পতিগৃহে? সেখানে ম্লেচ্ছকর্ত্তৃক অপহৃতার স্থান হইবে কি? স্বামী পরম নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত, আমাকে গ্রহণ করিবেন কি? নারীর যাহা সার ধর্ম্ম তাহা যে হারাই নাই, সে কথা বিশ্বাস করিবেন কি? যদি বিশ্বাস করেন, প্রণয়পরবশে আমায় গ্রহণও করেন, সমাজ আমায় গ্রহণ করিবে কি?—অসম্ভব। তবে আমার জন্য

তাঁহাকে অসুখী করি কেন, সমাজে নিগৃহীত করি কেন? আমার সুখের জন্য তাঁহার সুখসম্ভ্রম বলি দিই কেন? চির-সম্মানিত যিনি তাঁহাকে অপমানিত দেখিব? আমার সুখের জন্য তাঁহার অকলঙ্ক জীবনে কলঙ্ককালিমা লেপন করিব? তার চেয়ে মরণাধিক, দুঃখময় জীবন যাপনও ভাল। তবু তাঁহাকে দুঃখভাগী করিব না, তাঁহার অতুল প্রেমের বিনিময়ে অনন্ত জ্বালা ডালি দিব না। কিন্তু বিমলা আমার, সে যে মা বর্ত্তমানেও মাতৃহারা হইবে। তাহাকে কে দেখিবে? কে সাদরে সযত্নে পালন করিবে? যে নয়নের পুত্তলী আমার আমা ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না সে আমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া বাঁচিয়া রহিবে? কাঁদিয়া কাঁদিয়া স্বর্ণলতা আমার শুকাইয়া যাইবে। না, না, যাঁহার ধন তিনি তাঁহার নিকটে রাখিবেন। আমার ভাবনা কি? তাঁহার স্নেহরসে সে সঞ্জীবিত হইবে। কিন্তু যাহাকে দিবানিশি নয়নে নয়নে রাখিয়াও নয়ন তৃপ্ত হয় নাই, যাহাকে বুকে বুকে রাখিয়াও হৃদয় আমার জুড়ায় নাই, সেই অঞ্চলের নিধি জন্মের মত ত্যাগ করিয়া কিরূপে দিন কাটাইব?—যা' হইবার হউক, তাহার আশাও আমাকে ছাড়িতে হইবে। নহিলে তাহাকে আজীবন অসুখী করিতে হইবে, অভাগিনী চিরকুমারী রহিবে। যবনধৃতা মাতার সংস্পর্শে কলুষিতা কন্যাকে কে বিবাহ করিবে? পতিপুত্রীবিচ্যুতা হইয়া চিরকাল কাটাইব, সেও ভাল,—তবু আপনার সুখের জন্য এমন সর্ব্বনাশ সাধিয়া আনিব না। প্রাণপ্রিয় সব ছাড়িয়া এখন কোথায় আশ্রয় লই? সাঁতোড়ে

পিত্রালয়ে যাইব কি? সেখানেই বা বৃদ্ধ পিতামাতাকে বৃথা অসুখী করি কেন? একটা তুচ্ছ নারীজীবনের জন্য চারিদিকে অশান্তির আগুন জ্বালি কেন? হা অদৃষ্ট, কোথাও আর মুখ দেখাইবার উপায় নাই! হে বিশ্বনাথ, জীবনান্তকাল দহিবার জন্যই কি এই পোড়া রূপ দিয়াছিলে?"

দুঃখে কষ্টে অভাগিনীর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িল। যুগল তাহা দেখিতে পান নাই। তিনি মহিলাকে নীরব দেখিয়া কহিলেন, "মা, এখানে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা ভাল নয়। পাষণ্ডেরা হয় ত জোট বাঁধিয়া আসিতে পারে। আপনাকে কোথায় লইয়া যাইব শীঘ্র বলুন।"

জয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "পৃথিবীতে কোথাও আমার স্থান নাই।"

কথাগুলি সামান্য, কিন্তু উহা বিলাপের সঙ্গে নিরাশার সুরে গাঁথা, যেমন করুণ তেমনি মর্ম্মভেদী। যাহা শুনিলে পাষাণও গলে এ সেই কঠোরহৃদয় দ্রবকারী, হতাশের রুদ্ধ বেদনার ভাষাময় তপ্তশ্বাস!

ইহা শুনিয়া যুগলের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। তিনি ভাবিলেন, "হায়, হায়? পাপিষ্ঠ কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে! আজ ইনি উহারই জন্য নিরাশ্রয়া, সংসারে নারীর যে প্রধান অবলম্বন তাহা হইতে পরিচ্যুতা, হৃতসর্ব্বস্বা! পাষণ্ডের পাপের সমুচিত দণ্ড দিব। আর্ত্তের রক্ষা যেমন আমাদের ধর্ম্ম, তেমনি দুষ্কৃতের দমনও আমাদের ব্রত। কিন্তু এখন ইহাকে লইয়া কি করিব?

আপাততঃ সেরপুরেই লইয়া যাই, পরে যে ব্যবস্থা হয় করা যাইবে।” যুগল প্রকাশ্যে কহিলেন, “মা, আপনার বিংশতি সন্তান নিকটে, আপনার স্থানের অভাব কি ?”

জয়া। আপনারা এই বিপন্নার সহায়, নিরাশ্রয়ার আশ্রয়; ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করিবেন। আপনারা যেখানে ইচ্ছা আমাকে লইয়া চলুন।

যুবকেরা জয়াকে লইয়া সেরপুর অভিমুখে চলিলেন। জয়া যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, “যে সমাজের ভয়ে পতিগৃহে বা পিত্রালয়ে গেলাম না, অন্যত্রও সেই আশঙ্কা তুল্যরূপে বর্ত্তমান। যেখানে যাইব, অপবাদ সঙ্গে যাইবে, কলঙ্কের পশরা মাথায় লইতে হইবে। হায় সমাজ, হায় রমণীর জীবন! এখানেও কত লোকে কত কুৎসা রটাইবে, কত লজ্জার কথা বলিবে। বালিকা-যুবতী বৃদ্ধার বিদ্রূপ কটাক্ষের বিষদিগ্ধবাণে জর্জ্জরিত হইয়া পরাশ্রয়ে বাস করিতে হইবে। সতী আমি, নিষ্পাপ আমি এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? লোকে বলিবে, আত্মাপরাধস্খালনের জন্য এরূপ অনেকেই বলিয়া থাকে। পতি হারাইলাম, কন্যা হারাইলাম, জাতি হারাইলাম, আত্মীয় স্বজন পরিজন আশ্রয় সব হারাইলাম, সহায়শূন্যা, নিঃসঙ্গা, নিরাশ্রয়া হইলাম। নারীনিগ্রহকারীর অত্যাচারে ও তাহার অধিক প্রবল অত্যাচারী নির্ম্মম একচক্ষু সমাজের উৎপীড়নে পিষ্ট, দলিত, জর্জ্জরিত হইলাম। মিথ্যা কলঙ্ককালিমা লইয়া কলঙ্কিনী নাম ধারণ করিয়া এই ব্যর্থ জীবন-ভার বহন করিয়া কি লাভ? মৃত্যুই আমার একমাত্র গতি, একমাত্র

পথ। যাহার কোথাও স্থান নাই, শান্তি নাই, যমই তাহার সহায়, সম্বল, আশা, আশ্রয়। কিন্তু অকূল বিপদসাগরে পড়িয়াও হৃদয়-সর্ব্বস্ব পতিদেবতার আশীর্ব্বাদে আমি যে ধর্ম্ম বাঁচাইতে পারিয়াছি এ কথা তাঁহার চরণে নিবেদন না করিয়া মরিতে ইচ্ছা হয় না। বড় সাধ, বড় আকিঞ্চন, তাঁহাকে একবার দেখিয়া মরিব।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আজও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। বেণী উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার মাথার উপর ঝড় বৃষ্টি বহিয়া যাইতেছে, ঝঞ্ঝা উন্মাদের মত ছুটিয়া আসিতেছে, কোনদিকে দৃক্‌পাত নাই। তাঁহার মাথার উপর প্রভাতের কনক রৌদ্র, মধ্যাহ্নের তীক্ষ্ণোজ্জ্বল কর, সায়াহ্নের ম্লানরশ্মি পর্য্যায়ক্রমে বর্ষিত হইতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার মুখমণ্ডল কখনও হাস্যস্নিগ্ধ, কখনও অশ্রুপ্লুত, কখনও আশাপ্রদীপ্ত, কখনও নিরাশাদিগ্ধ, কখনও কঠোর, কখনও কাতর। ধূ ধূ প্রান্তর, সেখানে জনসমাগমমাত্র নাই। মধ্যে মধ্যে দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া এক একবার বিদ্যুৎস্ফুরণ হইতেছে। রুক্ষকেশ, উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি বেণীমাধবকে সেই আলোকে বোধ হইতেছে যেন একটা বিশালসত্তা মেঘস্পর্শী কেশ লইয়া বিরাট্‌রূপে দণ্ডায়মান, অনন্তগ্রাসী অন্ধকারে যেন একটা তেজোবহ্নি ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে! আকাশে মেঘ ডাকিতেছে—দুরু দুরু গুরু গুরু, নিম্নে বেণী মাকে ডাকিতেছেন, 'কালী, করালী, অম্বিকে, সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে!'

বেণী উন্মত্তের ন্যায় সেই প্রান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। আপনা আপনি বলিতেছেন, "কই আলো?—নিভে গেল, নিভে গেল। আলো আমার শ্রেয়ঃ, আলো আমার প্রেয়, আলো আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল। কই আলো?—মা, মা, একটু আলো,

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আর একটু আলো দেমা, দেখা মা!—কি ক্ষোভ, কি পরিতাপ! যে কাননে একদিন বনস্পতি বিরাজ করিত, আজ তাহা কণ্টকে, গুল্মে, বল্মীকে পূর্ণ। ইহারাই কি তাহারা? চারিদিকে জাড্য, মনুষ্যত্ববিলোপী নিস্পন্দভাব। ইহারা সৈকতবদ্ধ সমুদ্রবারি, সাগরের বিরাট্ জলকল্লোল শুনিয়াও তাহাতে আপনা মিশাইতে পারিতেছে না। ইহাদের চিত্তনদী নিশ্চলবারি পল্বলের ন্যায় পঙ্কিল, শীর্ণ, বিশুষ্ক। আছে কুসংস্কারের জীর্ণ পরিচ্ছদ, অন্ধ গর্ব্ব, মিথ্যা মোহ, বিলাসিতার বিজাতীয় অভিনয়! পাঠানদিগের এত অত্যাচারেও ইহাদিগের চেতনার নাড়ী স্পন্দিত হইতেছে না, আত্মপ্রত্যয় জন্মিতেছে না। ব্যষ্টির দুঃখে সমষ্টির প্রাণে বেদনা লাগিতেছে না। বিরাট্ তরঙ্গের মত মোগলের বাহিনী বঙ্গভূমি গ্রাস করিতে আসিতেছে। তবু কেহ সে গতি রোধ করিতে অগ্রসর হইতেছে না। ইহারা মনুষ্যপ্রজাপতি,—হাসিতেছে, গাহিতেছে, বিলাসব্যসনে আত্মহারা হইয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। কেহ সন্ন্যাস বা চির-কৌমার্য্যের আলেয়ার পশ্চাতে ঘুরিতেছে, কেহ ভোগের ও ঐশ্বর্য্যের আলেয়ার পশ্চাতে ঘুরিতেছে। মার কথা সকলেই ভুলিয়া গিয়াছে। সকলেই জ্যোতিঃহারা, আত্মবিস্মৃত। ইহারাই কি অমৃতের পুত্র?—অমঙ্গলের মধ্য হইতেই মঙ্গলের উৎপত্তি, লৌহের আঘাতে ও বিদারণেই স্বর্ণের জ্যোতির্বিকাশ। কিন্তু শত উৎপীড়নেও, অরাজকতায়ও ইহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হইল না। ইহারা একটা বড় ভাব ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে না। যাহার কাছে যাই সেই উপহাস করে,

আমায় চেনে না। বলে, আমি পাগল, পত্নীহারা হইয়া আমার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়াছে। ভূম্যধিকারিগণ নৃত্যবিলাসে ও প্রজা-পীড়নে রত, পণ্ডিতেরা ব্যাকরণ ও স্মৃতির চর্চ্চায় পটু, চণ্ডীর মন্ত্র ভুলিয়া 'আবৃত্তি'মাত্রে গর্ব্বিত। দেশের এই দুর্দ্দশার দিনে স্বার্থান্ধ বিমূঢ়াত্মা ভূস্বামীদিগকে একদিন নৃত্যোল্লাস হইতে বিরত হইতে বলিলাম। তাহারা হাসিয়া উঠিল। দেশটা যেন তাহাদের নিকট সম্পূর্ণ নিরর্থক শব্দমাত্র মনে হইল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে কহিলাম, "তোমরা চণ্ডীর মানে বুঝ না, অথচ তোমরাই পারমার্থিক গুরু। কেবল সাপের মন্ত্র পড়িয়া সময় নষ্ট করিতেছ!" তাহারা 'বদ্ধপাগল' বলিয়া আমাকে দূর করিয়া দিল। ফিরিবার সময় দেখি, কয়েকজন ভিখারী খঞ্জনি বাজাইয়া গায়িতেছে,—

(ও ভাই) একা এসে একা যেতে যে হবে,
সাথের সাথী কেউ না ভবে! (হায় রে)—

শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। সহসা মনে হইল, এইরূপ এক একটি গ্রাম্য গীতে, এক একটি গ্রাম্য কথায় বাঙ্গালার কি সর্ব্বনাশ হইতেছে। উহা লোকের মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া আর্য্যরক্ত দূষিত করিতেছে। আমি ভিখারীদের বলিলাম, 'এ গান তোমরা আর গাহিও না।' তাহারা অবাক্ হইয়া বলিল, 'কেন, ইহাই তো আমরা পুরুষানুক্রমে গাহিয়া আসিতেছি। ইহা গাহিয়াই দুয়ারে দুয়ারে দু'মুঠা ভিক্ষা পাই। ঠাকুরের মাথা খারাপ হইয়াছে কি?" আমি তাহাদের মারিতে গেলাম। বলিলাম, "তোদের এ সব গান আর গায়িতে দিব না। পালা, পালা,—

নহিলে খুন করিব।” তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া, আমার প্রতি মুখভঙ্গী করিয়া “পাগল ঠাকুর, পাগল ঠাকুর” বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। হায় মা, অধঃপতনের দিনেও সঙ্গীত তত্ত্বজ্ঞানের সহায়রূপে সমাদৃত! একি লীলা মা তোর? ইহারা বলে, একা আসিয়াছি, একা যাইব, একা সব করিব। কি ভুল, কি ভ্রান্তি!—একা কে? ফুল কি কিরণ ছাড়া, জ্যোৎস্না ছাড়া, রস ছাড়া, বাতাস ছাড়া? নদীর বারিবিন্দুগুলি কে কাহাকে ছাড়া? সব যে গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি। ঐ বিন্দুগুলির সমষ্টিতেই সাগর সাগর। ঐক্যতানবাদনের কোন্ যন্ত্রী কাহাকে ছাড়া? সমতানতায়ই না প্রত্যেকের সার্থকতা। জীবদেহস্থ কোষ অন্যান্য কোষের সহযোগিতায়ই দেহকে পুষ্ট করে। একা কি করিতে পারে? মধুচক্রের কোন্ মৌমাছি কাহাকে ছাড়া? ব্যষ্টি ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, দুর্ব্বল; সমষ্টি বৃহৎ, বিরাট্, অনন্তশক্তিধর। ইহারা এই সামান্য কথাটি বুঝিল না। ইহারা একা স্বর্গে যাইতে চায়, একা বৈকুণ্ঠে ক্ষীরসরনবনী খাইতে চায়। বলে, একা আত্মোন্নতি করিবে, একা দুর্গোৎসব করিবে,—বারোয়ারি হইলেই দলাদলি। ইহাদের উপায় কি? ভরসা কি? মা, মা, তুই যে “সর্ব্বভুতেষু জাতিরূপেন সংস্থিতা”, ইহারা তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। তুই যে তেত্রিশ কোটি দেবতার অঙ্গ থেকে তেত্রিশ কোটির শক্তি লয়ে আবির্ভূতা হয়েছিস্ ইহারা তাহা জানে না। জানে না,

“ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥

অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহত্তেজস্তচ্চৈকং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্ত লোকত্রয়ন্তিষা॥"

তুই যে সমস্ত দেবের তেজোরাশিসমুদ্ভবা তাহা ইহাদের মনে নাই। ইহাদের মনে নাই, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রপাৎ।" ইহারা ধনঞ্জয়ের ন্যায় বলিতে পারে না,—

"পশ্যামি দেবাংস্তব দেবদেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"

তাই না এই দুর্গতি, তাই না এই অধঃপতন, তাই না আমি লোকালয় ছাড়িয়া বিজন প্রান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছে, একটিও মানুষ দেখিতে পাইতেছি না। ঐ যে অদূরে অরণ্য,—অরণ্যই আমার চিরশরেণ্য, চিরধরেণ্য। লোকালয় হইতে অরণ্য ভাল, মানুষ হইতে পশু ভাল। চারিদিকে

বিস্মৃতি—ঘোর বিস্মৃতি—দারুণ বিস্মৃতি। বিস্মৃতির ভিতর স্মৃতির স্থান নাই। তাই অরণ্যবাসী হইব।—মনুষ্যকীট পিষ্ট হউক—নষ্ট হউক। পাঠান, থাক, আরো কিছুদিন থাক, আরো অত্যাচার কর। তুমি হিন্দুর ধর্ম্মনাশ করিতেছ, জাতিনাশ করিতেছ, মাতা পত্নী দুহিতা ভগ্নীর সতীত্বনাশ করিতেছ। তবু ইহাদের হাতে চিড়িয়া, মাথায় বাবরি, বিলাসিতা কত,—তবু ইহারা নীরব, নিশ্চল, জড়ভাবাপন্ন! পাঠান, তুমি এই কুম্ভকর্ণদিগের নিদ্রাভঙ্গ করিতে না পার, চলিয়া যাও, অধঃপাতে যাও। মোগল এস, পাঠান যাহা পারে নাই তুমি তাহা কর, যদৃচ্ছা উৎপীড়ন কর, ইহাদিগকে অবিরাম তপ্তকটাহে দগ্ধ কর। এই লক্ষ লক্ষ কপি, শৃগাল, কুক্কুর, গৃধ্র, সর্পগুলিকে তপ্তকটাহে দগ্ধ করিয়া ডাকিনীর তৈল প্রস্তুত কর।”

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এদিকে জয়ার রূপবহ্নিতে আর একটি পতঙ্গ ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে উদ্ধারকারীদিগের অন্যতম, যুগলকিশোর সান্ন্যালের ভাগিনেয়, রাসবিহারী মৈত্র। রাসবিহারীর বয়স বিংশতি বর্ষ। সে যুবতীর অতুলনীয় রূপলাবণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেও দুশ্চরিত্র, দুর্ব্বিনীত ছিল না বলিয়া নির্লজ্জ, লালসাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিত না। তাহার দৃষ্টি যেন ভীত, চকিত, আত্মগোপনে সমুৎসুক। সে সুন্দরীকে লুকাইয়া দেখিয়াই তৃপ্ত হইত, তাঁহার আদেশপালনে ও আদেশপ্রতীক্ষায় সুখী হইত, ইহার অধিক সুখ চাহিত না, প্রতিদানের কামনা করিত না, ভালবাসিয়াই উল্লসিত হইত। রাসবিহারী এখন হইতে বিনিদ্র হইয়া জয়ার অনন্ত রূপরাশি তদ্গতচিত্তে ধ্যান করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল।

কিন্তু বেশী দিন এভাবে গেল না। জয়া এই হতভাগ্য যুবকের হৃদয় দর্পণের ন্যায় দেখিতে না পাইয়াছিলেন এমন নয়। তিনি ভাবিলেন, "এই পোড়া রূপই আমার কাল। কোন্ পাপে ভগবান্ আমায় এই রূপ দিলেন? এ যে এতদূর শত্রু হইয়া আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে কোন দিনও তো তাহা ভাবি নাই। ইহাকে অবিলম্বে দূর করিতে না পারিলে আমার শান্তি

নাই, স্বস্তি নাই, নিস্তার নাই। ইহার জন্য আমাকে হয় ত, আরও বিপন্না হইতে হইবে। এ কণ্টক দূর করিয়া ফেলাই ভাল।” এইরূপ চিন্তা করিয়া একদিন রাত্রিকালে জয়া তাঁহার মুখমণ্ডল ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিলেন। ললাট ও গণ্ডদ্বয় হইতে শোণিতস্রোত বহিতে লাগিল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, দৃক্‌পাত নাই। বিরূপা হইয়া তাঁহার আনন্দ কত, সুখ কত! আজ হইতে একটা পাপ দূর হইয়া গেল, মহা শত্রু অপসারিত হইল, এই আনন্দে হতভাগিনী আঘাতের যাতনা ভুলিয়া গেলেন।

পরদিন প্রত্যূষে যুগল ও তাঁহার ভগ্নী রমাসুন্দরী এই কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইলেন। রাসবিহারী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, স্তব্ধভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সে ধীর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, “মা, আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। উনি যে ভয়ে আপনাকে কুশ্রী কদাকার সাজাইয়াছেন আমি তাহা দূর করিব।”

ইহা বলিয়া উত্তরীয় লইয়া রিক্তপদে রাসবিহারী চলিয়া গেল। যুগল ভাবিলেন, সে কোন পাষণ্ডকে শাস্তি দিতে যাইতেছে। রমা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। রাসবিহারী যে নিজেই এই ঘটনার মূল ও আপনি আপনাকে শাস্তি দিতে যাইতেছে তাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারেন নাই।

কবিরাজ আসিলে জয়া চিকিৎসকের প্রস্তাবিত কোন প্রলেপ দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি রমাসুন্দরীকে বলিলেন, “অমনি আপনাদের নিকট আমি নানাভাবে ঋণী। আমার জন্য আপনারা

অনেক ব্যয়ভার স্কন্ধে লইয়াছেন। তাহার উপর অনর্থক চিকিৎসার ব্যয় আর চাপাইব না।"

ক্রমে দ্বিপ্রহর হইল। তবু রাসবিহারী ফিরিয়া আসিল না। বেলা গেল। এখনও তাহার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। যুগল পাড়ায় পাড়ায় ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলিতে তাহার উদ্দেশ করিয়া ব্যর্থকাম হইয়া বাড়ীতে আসিলেন। রমাসুন্দরী সেদিন রন্ধন করিলেন না, কিছুই আহার করিলেন না।

জয়ার কাণ্ড ও রাসবিহারীর পলায়ন চিন্তা করিয়া যুগলকিশোর মনে মনে প্রথম ঘটনার সহিত দ্বিতীয় ঘটনা যোজনা করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ভাগিনেয়ই অভাগিনীর সৌন্দর্য্যবিকৃতির কারণ।

অনেক অনুসন্ধানেও যখন রাসবিহারীর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না তখন সকলেই অনুমান করিল, সে আত্মহত্যা করে নাই, নিরুদ্দেশ হইয়াছে। রমাসুন্দরী কোন প্রবোধ মানিলেন না। তিনি যুগলকিশোরের বাটীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। পুত্রশোকে তাঁহার অবস্থা পাগলিনীর মত হওয়ায় যুগলের বাড়ীর সকল বিষয়ে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রমাসুন্দরী জয়াকে তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল বলিয়া পুনঃ পুনঃ ধিক্কার দিতে লাগিলেন। যুগলকে বলিলেন, "কেন এই অলক্ষ্মীকে সংসার ছারেখারে দিতে ঘরে নিয়ে এলি? ওযে নিজের সর্ব্বনাশ আগে ক'রে পরের সর্ব্বনাশ করিতেই এখানে এসেছে। হায় হায়, ওরই জন্য আমি পুত্রহারা হলেম!"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুশ্চরিত্র ভাগিনেয় সংসার হইতে আপনি দূর হইয়াছে বলিয়া যুগল সুখী হইয়াছিলেন। নহিলে তিনিই তাহাকে দূর করিতেন। কিন্তু দিদির মনে দুঃখ না দিয়া তিনি এ সব ভৎ´সনায় কর্ণপাত না করিয়া বন্ধু চণ্ডীপ্রসাদ রায়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বন্ধু আসিলে তিনি তাঁহাকে সকল কথা জানাইয়া বলিলেন, "ভাই, আমাদের এখানে এই দেবীর বাস এখন দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে। তুমি আশ্রয় না দিলে তিনি হয়ত কোথাও চলিয়া যাইবেন এবং তিনি আবার বিপদে পড়িলে সে পাতক আমাদেরই হইবে। সতীকে তোমার বাটীতে স্থান দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কর ভাই! এমন দেবীর জীবন আমি কোনমতে নষ্ট হইতে দিতে পারি না। তুমি বুঝিতেছ না, এই সব মহাশক্তির অংশরূপিণী মহিলাদের পুণ্যময় জীবনই এই অভিশপ্ত দেশের একমাত্র ভরসা ?"

চণ্ডীপ্রসাদ। দাদা, এই দেবী কি আমার বাড়ীতে বাস করিতে সম্মতা হইবেন ?

যুগল। সে ভার আমায় দাও। তিনি রাজি হইলে—

চণ্ডী। আর কোন কথাই নাই। বাড়ীতে আমার স্ত্রী ও পুত্রকন্যা আছে। কোন অসুবিধা হইবে না। তোমার মত আমিও শৈশবে মাতৃহীন। স্ত্রীকে বলিব, আমি মাকে ঘরে আনিয়াছি। আর যুগলদা, তুমি স্থির জানিও, আমার মার পূর্ব্বকথা ঘুণাক্ষরেও পোতাজিয়ায় কেহ জানিতে পারিবে না। সন্তান হইয়া মাকে অসুখী করিব না।

বেণী রায়।

যুগল। চণ্ডী, তুমিই মার সার্থক পুত্র। তুমিই তাঁহার ভার লও।

যথাসময়ে জয়ার নিকট পোতাজিয়া যাইবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন ও ইহার পর হইতে চণ্ডীপ্রসাদের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

যুগলের দুশ্চিন্তা দূর হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হৃষীকেশ তর্কালঙ্কারের শ্বশুরবাড়ী কাছিকাটা গ্রামে। তিনি বেণীরায়ের স্ত্রীর অপহরণ সংবাদ শুনিতে পাইয়া ব্যস্ত ভাবে শ্বশুরালয়ে আসিয়া দাসীকে জিজ্ঞাসিলেন, "বোবার মা, এরা—অঁ্যা—এরা এখানে আছে তো ?" বোবার মা কতকগুলি বাসন লইয়া মাজিতে বসিয়াছিল। দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। জলবিন্দু স্পর্শ করে নাই। কাজেই সে খোস্ মেজাজে ছিল না। তর্কালঙ্কারের কথার জবাব দিল না। তখন ব্রাহ্মণ আরও কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, "তুমি কথা কও না কেন গা? মুখও ভার দেখ্ছি। বলি, দিদিমণি এখানে আছে তো ?"

বোবার মা রাগ করিয়া বলিল, "থাক্‌বে না তো যাবে কোথায় গা ?"

তর্কালঙ্কার। সোজা ক'রে বল, বোবার মা! সোজা ক'রে বল! তাকে কেউ ধ'রে নিয়ে যায়নি তো ?

বোবার মা। আর তো মানুষ পেলে না!

সত্য বলিতে গেলে অপহৃতা হইবার আশঙ্কা তর্কালঙ্কারের স্ত্রীর আদবে ছিল না। রূপ ভয়ে ভয়ে হৃষীকেশ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ীর সংস্পর্শ ছাড়িয়া থাকিত।

দাসীর সহিত কথোপকথনে আর সময়ক্ষেপ না করিয়া তর্কালঙ্কার উচ্চৈঃস্বরে শ্যালকের নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে

শ্বশুরবাড়ীর অন্তঃপুরমধ্যে সোজাসুজি উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের পত্নী সুরেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন, "বড় পুণ্যের জোর, তাই তোমাকে ফিরিয়া পাইলাম। তোমাকে যে পাইব সে ভরসা ছিল না।"

সুরেশ্বরী। তাই দেখ্তে এসেছ ?

তর্কালঙ্কার। হাঁ, হাঁ, তা' পাষণ্ডেরা তোমাদের বাড়ী তো চড়াও করে নি ?

সুরেশ্বরী। (কপট ক্রোধ করিয়া) তা'হলে তোমার হাত থেকে জন্মের মত রক্ষা পেতেম।

তর্কালঙ্কার। (কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া) রাম, রাম, ও কথা বলিও না। বেণীমাধবের দর্প যে চূর্ণ হইয়াছে ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট। বড় পণ্ডিত বলিয়া হতভাগার বড়ই অহঙ্কার হইয়াছিল। তর্কালঙ্কারকে তোয়াক্কা করিত না। বুঝিলে, অতি দর্পে হতা লঙ্কা।"

সুরেশ্বরী। কি বল ঠিক নাই, তাঁর এত বড় বিপদে শত্রুও যে দুঃখ করিতেছে! গ্রামের ছোট বড়, চাষা ভদ্র সকলেই 'হায়! হায়!' করিতেছে। আর তুমি স্বজাতি হ'য়ে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত হ'য়ে এমন কথা কহিতেছ। যদি তুমি একবার বেণীমামার সেই নিরাশা কাতর মূর্ত্তি দেখিতে! সেই শান্তসুধীর আকৃতি এখন যেন ঝড়ের পূর্ব্বকার স্তব্ধ ভাবের মত ভীষণ হইয়াছে। চক্ষে অশ্রুবিন্দু নাই, আছে কেবল দুঃখের দীর্ঘ তপ্তশ্বাস। সেদিন তিনি বিমলাকে তার মামার বাড়ীতে রাখিতে গেলেন। আর আসিলেন না। লোকে বলিতেছে তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

তর্কালঙ্কার। তবে এখন হইতে আমার প্রাধান্য নষ্ট করে কে ? আমার ব্যবস্থাই বলবৎ রহিবে, আমার সম্ভ্রম বর্দ্ধিষ্ণু হইবে।

সুরেশ্বরী। ছিছি, তোমার হৃদয়ে একটু দয়া নাই, একটু সমবেদনা নাই।

তর্কালঙ্কার। শোন সুরেশ্বরি, আমার মনে হয়, তোমার সহচরীকে ধরিয়া লইবার মূল আমাদের গ্রামের সর্দ্দার জলিল ও খলিল। তাহারা আমার নিকট যেদিন বেণীমাধবের সন্ধান লয় সেইদিনই রাত্রে এই ঘটনা ঘটে। পাঠানেরা যাই আমার কাছে শুনিল বেণীঠাকুর সাঁতোড়ে আছে অমনি আমাকে এই আস্‌রফি বক্‌সিস দিল। ইহা তোমারই জন্য আনিয়াছি, সুরেশ্বরি !

সুরেশ্বরী। তুমিই তবে তাদের গোয়েন্দা ?

তর্কালঙ্কার। গোয়েন্দা নই, সরলভাবে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলাম। ইহার বেশী কিছু করি নাই।

সুরেশ্বরী। যবনের দান কেন গ্রহণ করিলে ? (কপট ভয় দেখাইয়া) রোস, তুমি যে জয়ার অপহরণকারীদের নিকট হইতে আস্‌রফি বক্‌সিস লইয়া গোয়েন্দাগিরি করিয়াছ তাহা এখানকার সকলকে বলিয়া দিতেছি।

তর্কালঙ্কার। (যজ্ঞসূত্র করে লইয়া) সুরেশ্বরি, সর্ব্বনাশ করিও না। আমায় ধরাইয়া দিলে বেণীমাধবের আশ্রিত বাগ্‌দি ও নমঃশূদ্রেরা ব্রহ্মহত্যা করিতেও ইতস্ততঃ করিবে না। তুমি বিধবা হইবে, আভীরা (অবীরা) হইবে।

সুরেশ্বরী। তবে বল, কাল প্রায়শ্চিত্ত করিবে ?

তর্কালঙ্কার। করিব।

সুরেশ্বরী। আর এমন কাজ করিবে না?

তর্কালঙ্কার। করিব না।

সুরেশ্বরী। এই আস্‌রফি পুকুরের জলে ফেলিয়া দিবে?

তর্কালঙ্কার। তা—তা' এতটা কাঞ্চনের মায়া ত্যাগ করিতে বলিও না। অবশ্য তুমি রহস্য করিতেছ, সুরেশ্বরি!

সুরেশ্বরী। তবে কাঞ্চন লইয়াই থাক, কামিনীর মায়া ত্যাগ কর। আমি আজই গলায় দড়ি দিব!

তর্কালঙ্কার। তা' হলে—অ্যাঁ—ওটা ফেলিয়া দিতে বল?

সুরেশ্বরী। এখনই।

অগত্যা তর্কালঙ্কার সেই আস্‌রফি পুষ্করিণীর জলে ফেলিয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তারপর সুরেশ্বরী বেণীর অনুগত লোচন বাগ্‌দিকে ও কৃষ্ণসর্দ্দারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং স্বামীর নাম গোপন করিয়া কহিলেন, "শোন লোচনদা, কৃষ্ণদা, আমার মনে হইতেছে জামালপুরের জলিলখাঁ বেণী মামার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তোমরা মামীকে উদ্ধার করিতে প্রস্তুত আছ কি?"

লোচন ও কৃষ্ণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "প্রাণ দিতে হয় তাও স্বীকার। তবু মা ঠাকুরাণীকে উদ্ধার করিয়া আনিব। আপনার আর কিছু বলিবার আছে?"

সুরেশ্বরী। না, তোমরা যাহা ভাল বুঝ কর।

লোচন ও কৃষ্ণসর্দ্দার একদিনের মধ্যেই ত্রিশ চল্লিশ জন বাগ্‌দি নমঃশূদ্র ও ভদ্রসন্তান জুটাইয়া লইয়া কামালপুরে রওনা হইল

সুরেশ্বরী স্বামীকে বলিলেন, "তুমি স্মৃতি পড়িয়া পণ্ডিত না হইয়া যদি লোচনদা ও কৃষ্ণদার মত চাষা হইতে তবে আর আমার দুঃখ ছিল না।"

তর্কালঙ্কার অধোবদনে রহিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভদ্র ও চাষার ভিতর অন্তরের ব্যবধান ইদানীন্তনকালের মত শোচনীয় ছিল না, অহঙ্কারের বৃতি বাঁধিয়া ভদ্র চাষাকে সহানুভূতির গণ্ডী হইতে দূরে রাখিতেন না, চাষাও ভদ্রের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইত না। তখন সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে আত্মীয়তার সম্বোধন,—দাদা, খুড়া, মামা প্রভৃতি—অবিরল, ভাণের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সভ্যতা অপরিজ্ঞাত, অন্তর ও বাহিরের দূরত্ব এত ভয়ানক ছিল না, মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব কেবল অভিধানের শব্দমাত্র ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আকাশ নির্ম্মল হইয়াছে। কিন্তু রজনীর অন্ধকার ধীরে ধীরে দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে! সম্মুখে বিস্তীর্ণ অরণ্য। সেখানে শালতমালতালঅশ্বত্থবটবদরী প্রভৃতি বিটপিরাজি অশ্রেণীবদ্ধ, অনন্ত। বৃক্ষে লতায়, পত্রে পত্রে নিবিড় আশ্লেষ, অঙ্গাঙ্গীভাব, বনান্ধকার ও রজনীর অন্ধকার গাঢ় অন্তরঙ্গভাবে মিলিত।

বেণীমাধব সেই মহারণ্যে প্রবেশ করিতেই সহসা স্কন্ধে মনুষ্য করস্পর্শ অনুভব করিয়া কহিলেন, "কে তুমি?"

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। আমি এই বনবাসী। তুমি কে?

বেণী। পান্থ।

বনবাসী। এখানে কেন আসিয়াছ?

বেণী। বাস করিব বলিয়া।

বনবাসী। লোকালয় ছাড়িয়া আসিলে কেন?

বেণী। মানুষ নাই বলিয়া।

বনবাসী বেণীমাধবের মুখের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলেন। ভাবিলেন, এ ব্যক্তি হয় উন্মাদ, নহিলে মহাপুরুষ। কহিলেন, "আমার সঙ্গে আইস।"

বেণীমাধব তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে কেহ কোন কথা কহিলেন না। অবশেষে উভয়ে এক পরিস্কৃত ভূমিভাগে একটি

কুটীরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেখানে পঁহুছিয়া বেণীমাধব দেখিলেন অন্যূন ত্রিশ জন ভীমকায় ব্যক্তি সসম্ভ্রমে সেই বৃদ্ধ বনবাসীকে অভিবাদন করিল। বনবাসী তাহাদিগকে কুশলপ্রশ্ন করিয়া সঙ্গীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞান ও প্রতিভাদীপ্ত নয়ন ও ললাট, তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রী, সুগৌর দীর্ঘাবয়ব, ঋষিকল্প মূর্ত্তি। তৎপরে বেণীমাধবকে জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ?" বেণীমাধব কহিলেন, 'হাঁ'। তখন বনবাসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আজ আমার বড় সৌভাগ্য আপনি আমার অতিথি হইয়াছেন।"

বেণীমাধব সে কথার কোন উত্তর না দিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তি-গণের প্রতি অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা কে?"

বনবাসী। আমার অনুচর।

বেণী। আপনি কে?

বনবাসী। গোবিন্দ সিংহ।

বেণী। দস্যুসর্দ্দার গোবিন্দ সিংহ?

গোবিন্দসিংহ। ইহারা দস্যু নয়, আমিও দস্যুসর্দ্দার নহি। আমরা শিষ্টের বন্ধু, দুষ্টের যম। পাপীর অর্থ অলঙ্কার লুঠিয়া লই, কিন্তু ধার্ম্মিকের কিছুই লই না। আমরা বৃথা নরহত্যা করি না, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করি না, নারীনিগ্রহ করি না।

বেণী। তবে আপনারা মানুষ?—লোকালয়ে মানুষ খুঁজিয়া পাইলাম না, অবশেষে এই বনের ভিতর মানুষ দেখিতেছি।

কথাগুলি সহসা গোবিন্দ সিংহের মর্ম্মের ভিতর আঘাত করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আজ পর্য্যন্ত মানুষের মত কি কি কাজ করিতে পারিয়াছেন। অনেক সময় এক একটি ক্ষুদ্র কথা আমাদিগকে আত্মবিচারে প্রবৃত্ত করে, কিন্তু উহা শীঘ্র এমনি কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায় যে আমরা তৎক্ষণাৎ জেরার মাঝখানে বিচারকার্য্য স্থগিত করিয়া বসি। গোবিন্দসিংহও তাহাই করিলেন। অবশেষে তিনি বেণীমাধবকে বলিলেন, "পূরা মানুষ হইতে পারিলাম কই, ভাই! এখন দিনকাল গিয়াছে, বুড়া হইয়াছি।"

বেণী রায় সেই হইতে শ্রীপুরের বনে বাস করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি দলপতিকে জিজ্ঞাসিলেন, "আচ্ছা, সর্দ্দার গোবিন্দ সিং, আপনি লোকালয় ছাড়িলেন কেন?"

গোবিন্দ সিংহ। সে অনেক কথা। আজ তাহা আবার মনে করিয়া দিলে কেন ভাই? একদিন আমারও সব ছিল। ধন-দৌলত আত্মীয় পরিজন কিছুরই অভাব ছিল না। আমরা তিন পুরুষ হইতে বাঙ্গালায় বাস করিতেছি। নাগর নদীর ধারে জামালগ্রামে আমাদের দু'শ বিঘা জমি ছিল, হাল লাঙ্গল ছিল, খাসখামার ছিল। বিষয়সূত্রে আলফু মিঞার পিতার সহিত আমার পিতার ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হয়। ক্রমে উভয় পক্ষে দাঙ্গা আরম্ভ হয়। তাহাতে আমাদের দুই দলেই অনেক লোক হতাহত হয়। ফৌজদার স্বয়ং এই ঘটনা তদন্ত করিতে আসেন। কিন্তু তিনি আমাদেরই দোষ বেশী বলিয়া পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে পিতা বিদ্রোহী হন। আমি

তখন প্রাপ্তবয়স্ক, দাঙ্গাহাঙ্গামায় ওস্তাদ। পিতাপুত্রে মিলিয়া আমরা ফৌজদারের সঙ্গে লড়িতে লাগিলাম। লড়াইয়ের ফলে পিতা সাঙ্ঘাতিকরূপে আহত হন। তাঁহাকে লইয়া আমি পোতাজিয়ার ভিতর দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ি। পথিমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তার পর আমি এই বনে আসি। এখানে থাকিয়া ধীরে ধীরে একটি বিশ্বস্ত দল গঠন করি। উহার সাহায্যে আমাদের চিরশত্রু আল্‌ফু মিঞার পিতাকে পুনরায় আক্রমণ করি ও স্বহস্তে তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া অন্যান্য দুর্ব্বৃত্তদিগকে দমন করিতে থাকি। এখনও তাহাই করিতেছি।

বেণী রায় মনে মনে কহিলেন, "দুর্ব্বৃত্তের দমন আপৎকালের ধর্ম্ম। আমিও সেই ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় হইব, শাস্ত্র ছাড়িয়া শস্ত্র চর্চ্চা করিব। অত্যাচারে অরাজকতায় দেশ পূর্ণ হইল। শান্তি নাই, স্বস্তি নাই। পাষণ্ডের ত্রাস জন্মাইতে হইবে, দুষ্কৃতের দণ্ড দিতে হইবে। সর্দ্দার গোবিন্দ সিং, আমি আপনার দলভুক্ত হইব।"

গোবিন্দ সিংহ কহিলেন, "ভাই, আমার কাহিনী তো শুনিলে। আজ তোমার গৃহত্যাগের কারণ না শুনিলে ছাড়িব না। তুমি কেন এই বয়সে বনবাসী হইতে আসিলে?"

তখন বেণী রায় আর আত্মগোপন না করিয়া সকল ঘটনা দলপতিকে বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া গোবিন্দ সিংহের নয়ন হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ফৌজদার জম্‌সেদ খাঁ ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা। তাঁহার প্রতাপে দুর্ব্বৃত্তেরা নিয়ত শঙ্কিতভাবে কালযাপন করে। প্রকাশ্য অত্যাচার, উৎপীড়ন অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আকবর বাদশাহের সৈন্যগণ বাঙ্গালায় আসিয়া পড়িলে প্রায় সর্ব্বত্রই অরাজকতা উপস্থিত হয়। তবু যাহা কিছু শাসন সুশৃঙ্খলা ছিল তাহা সর্দ্দার জম্‌সেদ খাঁর অধীন পরগণাগুলিতেই পরিলক্ষিত হইত। মোগল পাঠানে ভীষণ সংঘর্ষের সময় কোন ফৌজদারের মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম ছিল না। প্রত্যেক বলিষ্ঠ যুদ্ধেচ্ছু পাঠান যুবককে লইয়া দলগঠনে ও রসদসংগ্রহে রাজপ্রতিনিধিগণ ব্যস্ত। ইহাতে সর্দ্দার জম্‌সেদের তুল্য উৎসাহ আর কাহারও দেখা যাইত না।

জলিল খাঁ মনে করিয়াছিল তাহার কার্য্য সঙ্গোপনে সাধিত হইবে, কেহ জানিতে পারিবে না। পথিমধ্যে কোন বিপদ হইতে পারে সে এরূপ আশঙ্কা হৃদয়ে পোষণও করে নাই। তার পর সকল কথা যে ফৌজদারের কর্ণে পঁহুছিবে ইহা সে একেবারেই ভাবিয়া দেখে নাই। খলিল বুঝাইয়াছিল, জম্‌সেদ খাঁ যতই প্রতাপী বা সমদর্শী হন না কেন, বাদশাহের অমাত্যের জামাতাকে এই কারণে দণ্ড দিতে তিনি সাহসী হইবেন না। ' বিশেষ, যুদ্ধের জন্য তাঁহার অন্য বিষয়ে মনোযোগ দিবার কিঞ্চিন্মাত্র অবসর নাই। কিন্তু জলিল ও খলিলের সকল অনুমানই ব্যর্থ হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ফৌজদার জম্‌সেদের কর্ণে এই নারীনিগ্রহের সংবাদ পঁহুছিবামাত্র তিনি গোয়েন্দা লাগাইয়া গুপ্ত অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দেন। তাহার ফলে জলিল, খলিল এবং তাহাদের সহকারীরা ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। যে যত বড় অত্যাচারী হউক তাহাকে দমন করিতে জম্‌সেদ খাঁ কোনদিন পশ্চাৎপদ ছিলেন না। তিনি জানিতেন, প্রজাসাধারণের সন্তোষের উপরই বাদশাহের রাজ্যের ভিত্তি; হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, অপরাধী মাত্রেই সমভাবে দণ্ডনীয়। বাদশাহের জাতি বা উজির ওমরাহের আত্মীয় বলিয়া তাঁহার নিকট কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না।

অগৌণে তাণ্ডায় জলিলের শ্বশুর তাহার কারাবাসের সংবাদ জানিতে পারিলেন। তিনি ফৌজদারিবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা জম্‌সেদ খাঁকে হুকুম দেওয়াইলেন যে অবিলম্বে সর্দ্দার জলিল খাঁকে যেন মুক্ত করা হয়। ফৌজদার এইরূপ বে-আইনি আদেশ পালন না করিয়া জলিলের সংক্রান্ত সকল বিবরণ সরকারে পেশ করিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ জানাইলেন, "বাদশাহের অমাত্যের আদেশপালনই ফৌজদারের কর্ত্তব্য। তাঁহাকে ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে বলা হয় নাই। হুকুমমাত্রে সর্দ্দার জলিল খাঁকে কেন মুক্তি দেওয়া হয় নাই তাহার সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ যেন সপ্তাহকাল মধ্যে দাখিল করা হয়।"

জম্‌সেদ খাঁ ইহার কোনই কৈফিয়ৎ না দিয়া কার্য্যে ইস্তফা দিলেন। তিনি মনে মনে পাঠান রাজত্বের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায় কত কষ্টে, কত

শোণিতপাতে পাঠানেরা এই বঙ্গদেশ অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা প্রজার মনোরঞ্জন করিতে না পারিয়া এই রাজ্য হারাইতে বসিয়াছে। উর্দ্ধতন রাজপুরুষেরা ইন্দ্রিয়সেবায় ও উৎকোচ গ্রহণে রত, বাদশাহের স্বার্থ কে দেখিতেছে? প্রজাদের অধিকাংশ হিন্দু, তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপে ও রমণীদিগের সতীত্বনাশে তাহারা বাদশাহ সুলেমান করাণীর আমল হইতে উত্যক্ত। যখন কালাপাহাড় হিন্দুর উপর নির্ম্মম অমানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করে তখনই জানি এ রাজ্যে খোদার অভিসম্পাৎ আছে, এ রাজ্য আর টিকিবে না। বাদশাহ সুলেমান করাণীকে কত বুঝান হইয়াছে, কত কাকুতি মিনতি করা হইয়াছে, তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তার পর বায়াজিদ বাদশাহ হইলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতে পাঠান সর্দ্দারেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। বাদশাহের কনিষ্ঠ দাউদ শাহ বাঙ্গালার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখনও তাঁহার ১,৪০,০০০ পদাতিক সৈন্য, ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ৩, ৬০০ রণহস্তী, ২০,০০০ কামান। কিন্তু পাঠান সর্দ্দারেরা পূর্ব্বের ন্যায় একতাবদ্ধ নয়, প্রজারাও তাহাদের উপর সন্তুষ্ট নয়। ইহারা সমবেতশক্তি লইয়া মোগলের গতিরোধ করিতে দাঁড়াইলে, মুনিম খাঁ বা টোডর মল্লের সাধ্য কি বাঙ্গালা আমাদের হাত হইতে কাড়িয়া লয়? বাদশাহ বীরের ন্যায় প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছেন। বিরাম নাই, স্বস্তি নাই, মুহূর্ত্তের জন্য রণসজ্জা ত্যাগ না করিয়া তিনি অটল সঙ্কল্পে পাঠানরাজত্ব রক্ষা করিতে ব্রতী

আছেন। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, এ রাজ্য রক্ষা করিতে কাহারও সাধ্য নাই। সকলই কালের প্রভাব। কালনেমির আবর্ত্তনে একদিন পাঠান বাঙ্গালার ভাগ্যবিধাতা হইয়াছিল। সেই আবর্ত্তনেই আবার মোগল বাঙ্গালার বাদশাহ হইবে। যেখানে উত্থান, সেখানেই পতন। তাই পাঠানের উত্থানের পর তাহার পতনও অবশ্যম্ভাবী, স্বতঃসিদ্ধ। কালস্রোত কে রোধ করিতে পারে? যে সনাতন নিয়মের বলে সূর্য্যের উদয়াস্তলীলা, সেই নিয়মের বলেই আমাদের রাজত্বেরও এই উদয়াস্তরহস্য। এ রহস্য ভেদ করা মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমাদের চিন্তার অগোচরে, আমাদের বুদ্ধির অগোচরে অনন্তকুশলী সর্ব্ববিদ্ চক্রী কালচক্র নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আর সেই সঙ্গে মানুষের ভাগ্য, রাজ্যের ভাগ্য অবিরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এ চক্রের গতিরোধ করা অসম্ভব। হায়, অসহায় মানব, হায় দুর্ব্বার নিয়তি!

দশম পরিচ্ছেদ।

পূর্ণ বর্ষা। সদ্যঃস্নাতা স্নিগ্ধশ্যামাঞ্চলা ধরণী, নবোদ্ভিন্ন কিশলয়-কুলে তরুলতার সৌন্দর্য্যলহরী উচ্ছ্বসিত, কেকাধ্বনিত কানন, পূর্ণতোয়া স্রোতস্বতী, কুহেলিকাচ্ছন্ন দিঙ্মণ্ডল, ধূম্রাভ মেঘরাশি, অশনি মৃদঙ্গনিনাদিত আকাশ। বর্ষার মধ্যে কেমন এক অসীমের ভাব আছে, কেমন এক ছায়ার আবরণ আছে, বসন্তে তাহা নাই। বসন্তের সৌন্দর্য্য সংখ্যায় অনন্ত, কিন্তু সুস্পষ্ট, সীমাবদ্ধ, উজ্জ্বল, আতৃপ্তিভোগ্য। বসন্তের স্ফুটচন্দ্রিকাশালিনী রজনী, কোকিল-কাকলিমুখরিত, কুসুমদামরঞ্জিত, বিচিত্রবর্ণখচিত লতাকুঞ্জ প্রেমকে যেমন জাগ্রত করিয়া তোলে, ভোগেরও তেমনি উপাদান আনিয়া দেয়। বর্ষার মেঘান্ধ আকাশ, তাহার অন্ত নাই; দর্দ্দুর ঝিল্লি-শব্দিত বনভূমি, তাহাতে প্রণয়ের স্পষ্ট গীতি নাই;—সমস্ত সুন্দর, বিরাট্, ছায়াময়, অস্পষ্ট, অসীম। তাই বর্ষায় প্রেম জাগিয়া উঠে, ভোগে তৃপ্তি হয় না, মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, মিলিয়া আশা মিটে না। মধুরোজ্জ্বল বসন্ত, পরিতৃপ্ত সম্ভোগ; অনন্ত অস্ফুট বর্ষা, সঞ্চিত অতৃপ্ত প্রেম।

এই পরিপূর্ণ বর্ষায় জয়ার হৃদয় প্রিয়তমের জন্য ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে হৃদয়ের ক্রন্দন জগৎ দেখিতে পাইল না,—অন্তর্যামী দেখিলেন, কিন্তু নিয়তির গতি রোধ করিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

জয়া ভাবিতে লাগিলেন, "ভগবান্ দয়াময়, তবে অবলার প্রতি তিনি নিষ্করুণ কেন? শুধু কি কাঁদিবার জন্যই রমণীজীবন সৃষ্ট হইয়াছিল? হে দয়াল, হে অনাথনাথ, একটিবারও কি দাসীকে তাহার হৃদয়সর্ব্বস্বকে দেখিতে দিবে না? আর পরীক্ষা করিও না, নাথ! এই নিরাশ-হৃদয়ে একবার আশা দাও, বল দাও, মর্ম্মের মাঝারে একবার বলিয়া যাও, তাঁহাকে দেখিতে পাইব।"

পতিবিরহে জয়া আহার নিদ্রা একরূপ ত্যাগ করিয়াছেন। না খাইলে নয়, আশ্রয়দাতা চণ্ডীপ্রসাদের স্ত্রী সুনন্দা কিছুতেই ছাড়েন না, তাই একটা কিছু সিদ্ধপোড়া রাঁধিয়া খাইতে বসিতে হয়। জয়া না খাইলে সুনন্দা খাইতে চান না। অগত্যা পীড়ার ভাণ করিয়া জয়া অর্দ্ধাশন ও প্রায়োপবেশনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। একে নিয়ত বিমলার জন্য দুশ্চিন্তা ও পতিবিরহক্লেশ, তদুপরি অনাহার। জয়া সত্যই অত্যন্ত রুগ্না হইয়া পড়িলেন। চণ্ডীপ্রসাদ কবিরাজ ডাকাইলেন। বৈদ্য পাচন ও বড়ির ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। রোগিণী তাহার কিছুই গলাধঃকরণ করিলেন না। সুনন্দা ঔষধ খাইতে জিদ্ করিলে জয়া বলিতেন, "মা, আমার প্রাণের ভিতর যে ঘা হইয়াছে তাহা পাচন ও বড়িতে সারিবে না। তোমরা কেন অনর্থক অর্থ অপব্যয় কর? তুমি রমণী, আমার অন্তঃস্থল দর্পণের মত দেখিতে পাইতেছ। তবে কেন এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি কর?"

ক্রমে বিনা চিকিৎসায়, অনশনে ও দুর্ভাবনায় জয়ার শরীর অত্যন্ত কৃশ ও দুর্ব্বল হইল, পীড়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

এখন হইতে জয়া অত্যন্ত অন্যমনস্ক। দিনরাত্রি উদাসভাবে কি যেন ভাবেন। সবই তাঁহার ছিল, এখন কেন তাহা নাই? দেবোপম পতির অগাধ ভালবাসা, সন্তানের সরল প্রাণের মধুর আকর্ষণ, গৃহ, পরিজন, আনন্দ, কি না ছিল?—সব থাকিয়াও তিনি কোন্ অপরাধে তাহা হারাইলেন, অনাথা হইলেন? পূর্ব্বজন্মের কোন্ অভিশাপে তিনি এই বয়সে পতি ও দুহিতার সঙ্গ হইতে জন্মের মত বঞ্চিতা হইলেন, নির্ম্মম সমাজের চক্ষে চিরকলঙ্কিনী হইয়া রহিলেন? অতি কষ্টে জয়ার গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। স্বামীর মঙ্গলের জন্য তিনি স্বামীগৃহে যাইতে চান নাই, তাঁহার সুখের জন্য আপনার সুখ কামনা করেন নাই, ভোগাকাঙ্ক্ষা করেন নাই। এখন পতিকে দেখিবার জন্য যে ব্যস্ত হইয়াছেন তাহার কারণ, তিনি পতিকে শুধু ইহাই বলিতে চান যে তিনি রমণীর সারধর্ম্ম সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। এ কথা না বলিয়া জয়ার মরিতে ইচ্ছা হয় না। নহিলে, যিনি মানসমুকুরে প্রেমময়ের মূর্ত্তি সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেছেন তিনি কেবল নয়নের তৃপ্তির জন্য তাঁহাকে দেখিতে চাহিবেন কেন?

জয়ার প্রেম স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সিন্ধুর ন্যায় রত্নপ্রসূ, শূর্পের ন্যায় সারগ্রাহী, গঙ্গার ন্যায় মলবাহী।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

লোচন ও কৃষ্ণসর্দ্দার কামালপুরে আসিয়া শুনিল, সেরপুরের যুগলকিশোর সান্ন্যাল কিছুদিন হইল একটি যুবতীকে জলিল খাঁর হাত হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তাহারা দলস্থ সকলকে বিদায় দিয়া উভয়ে সেরপুরে রওণা হইল। সেখানে গিয়া তাহারা সান্ন্যাল মহাশয়কে দেখিতে পাইল না। কারণ, তিনি প্রায়ই বাড়ী থাকিতেন না।

রমাসুন্দরী ও একটি বৃদ্ধা দাসী ভিন্ন বাড়ীতে অন্য কেহ ছিল না। যে শোকে সান্ত্বনা নাই, যাহা ধৈর্য্য-স্থৈর্য্য-আয়ুঃ-বল সব বিনাশ করে, যাহাতে মস্তিষ্ক বিকারগ্রস্ত হয় সেই বিষম পুত্রশোকে রমাসুন্দরী পাগলিনীর মত হইয়া আছেন। দাসী কার্য্যব্যপদেশে বাহিরে আসিলে লোচন তাহাকে জয়াঠাকুরাণীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। দাসী বলিল, "জয়াঠাকুরাণী কে তা জানিনা, বাপু! তবে একজন ঠাকুরাণী এখানে কিছুদিন ছিলেন বটে। তিনি তো আর এখানে থাকেন না।" আগন্তুকদ্বয় পরে জানিতে পারিল, সম্ভবতঃ পোতাজিয়ার চণ্ডীপ্রসাদ রায়ের বাড়ীতে তিনি আজকাল থাকিতে পারেন। আর, সেখানে না থাকিলেও, চণ্ডী বাবুর নিকট তাঁহার খবর পাওয়া যাইতে পারে।

ইহা শুনিয়া তাহারা পোতাজিয়ায় আসিলে রায় মহাশয়ের দেখা পাইল। তিনি তখন সবে বাড়ী আসিয়াছেন। লোচন

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, কাছিকাটার পণ্ডিত মশাইএর ব্রাহ্মণী আপনার এখানে আছেন কি ?"

চণ্ডী। কার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?

লোচন। বেণী ঠাকুরের ব্রাহ্মণী, যাঁকে কামালপুরের খাঁ সাহেবেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাঁর খবর চাই, বাবু!

এতদিন ধরিয়া চণ্ডীপ্রসাদ যে রহস্যোদ্ভেদ করিতে পারেন নাই আজ তাহা এইরূপে সহসা জানিতে পারিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। কহিলেন, "বেণী ঠাকুরের ব্রাহ্মণী যে এখানে থাকিতে পারেন কে তাহা তোমাদিগকে বলিল ?"

আগন্তুকদ্বয় তখন তাহাদের সকল অনুসন্ধানের কথা তাঁহাকে জানাইল। সবিশেষ শুনিয়া তিনি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর মশাই এখন কোথায় আছেন বলিতে পার কি ?"

কৃষ্ণ। তিনি মা ঠাক্‌রুণের শোকে কোথায় যে চ'লে গেছেন তা কেউ জানে না।

চণ্ডী। তাঁর বাড়ীতে কেউ আছে ?

কৃষ্ণ। ছিল সবাই, এখন কেউ নাই। টোল উঠে গেছে, ছেলেরা চলে গেছে, মেয়েটিকে ঠাকুর মশাই সাতোঁড়ে রেখে গেছেন। ঘর দুয়ার সব শ্মশান হয়েছে। আহা, এমন লোকের এমন সর্ব্বনাশ হয় !

চণ্ডী মনে মনে কহিলেন "ধন্য মা, তোমার দৃঢ়তা। স্বামীর ও কন্যার মঙ্গলের জন্য তুমি একটিবারও আপনার মঙ্গলের দিকে ফিরে চাও নাই, নিজের সুখ পায়ে ঠেলেছ! যে সব ভয়ানক

কথা আজ এদের মুখে শুনিলাম তা শুনিলে তুমি প্রাণে বাঁচিবে না। একেই তুমি মরণের পথে পা বাড়াইয়া আছ। তায় এ সব দুঃসংবাদে তোমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আরো নিকট হইবে। শীঘ্রই এদের বিদায় দিই।" তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, "শোন, তোমাদের মা ঠাকুরুণ আমার এখানেই আছেন। কিন্তু তাঁর শরীর ও মনের অবস্থা খুবই খারাপ। তোমাদিগকে কাছিকাটার কোন সংবাদ তাঁকে দিতে দিব না। কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে তোমরা বাড়ী ফিরে যাও।"

লোচন। আমাদের খবরটা তাঁকে দেবেন না ?

চণ্ডী। এখন না। তাঁর শরীর ভাল হবার আগে এসব সংবাদ তাঁকে দিলে তাঁর অনিষ্ট হবে।

লোচন ও কৃষ্ণসর্দ্দার কাছিকাটায় ফিরিয়া গেল। সুরেশ্বরী তাহাদের মুখে জয়ার সংক্রান্ত সকল কথা জানিতে পারিয়া তর্কালঙ্কারকে ধরিয়া বসিলেন, তিনি একবার পোতাজিয়ায় যাইবেন। হৃষীকেশ এই বিপদ নানারূপে এড়াইতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "যাহাকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে, যাহার জাতি গিয়াছে, তাহার সহিত কোন সংশ্রব রাখা সমীচিন নয়।"

সুরেশ্বরী। তোমার জাতি নিয়ে তুমি থাক। আমি যাব, নিশ্চয়ই যাব। এই বিপদের সময় আমি তার কাছে যাব না ?

হৃষীকেশ। কার সঙ্গে যাবে ?

সুরেশ্বরী। তোমার সঙ্গে।

হৃষীকেশ। (হাসিতে হাসিতে) সে আর হইতেছে না। আমার হাতে এক বড় যজমানের কাজ আছে।

সুরেশ্বরী। আগে আমার কাজ ক'রে তোমার যজমানের কাজে যেও।

হৃষীকেশ। তাও কি হয়? বাত্যায় (ব্যত্যয়) হইবে। "যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং ব্রাহ্মণায়"—আহা—

সুরেশ্বরী। তবে আমি লোচনকেই সঙ্গে নিয়ে যাব।

হৃষীকেশ ভাবিলেন, তাঁর স্ত্রীর পক্ষে উহা অসম্ভব নয়। সে যে আরো বিপদের কথা। তিনি অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক অনুরোধ করিলেন। সুরেশ্বরী কোন কথা শুনিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে লইয়া পোতাজিয়ায় যাইতে হইল। কিন্তু গ্রামে প্রকাশ থাকিল, সুরেশ্বরী কামালপুরে পতিগৃহে যাইতেছেন।

বোবার মা বলিল, "কি গো, দিদিমণিকে নিয়ে খাঁসাহেবদের গাঁয়ে যাচ্চ। ভয় করে না?"

হৃষীকেশ। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমাদের গ্রামের দুর্দ্দান্ত যবনদের ফৌজদার গারদে পূরিয়াছে।

যথাসময়ে হৃষীকেশ সস্ত্রীক পোতাজিয়ায় পঁহুছিলেন। চণ্ডীপ্রসাদ যে আশঙ্কা করিয়া স্ত্রীকে বা জয়াকে কাছিকাটার কোন সংবাদ জানান নাই, এবার তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল। চণ্ডীপ্রসাদ বাড়ীতে ছিলেন না। সুনন্দা কিছু জানিতেন না। সুতরাং কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হইল না। সুরেশ্বরী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সুনন্দার সহিত সোজাসুজি জয়ার নিকটে গিয়া

প্রথমে ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। পরে বলিলেন, "আহা, অবশেষে এই দশা তোমার হয়েছে! তুমি গেলে বেণী মামাও কোথায় চলে গেলেন, বিমলা সাঁতোড়ে রইল, টোল উঠে গেল, লোকজন সব সরিয়া পড়িল, বাড়ী ঘর জঙ্গল হয়ে গেল, ভিটায় বাতি দিবার লোকটিও রহিল না। হায়, হায়, এমন বাড়ীর এমন হাল হ'ল। এমন লোকের এমন সর্ব্বনাশ হ'ল!"

হঠাৎ এতগুলি দুঃসংবাদ ও অতীতের স্মৃতি জয়াকে যুগপৎ অভিভূত করিল। তিনি সহসা মূর্চ্ছিতা হইলেন। সুনন্দা ও সুরেশ্বরীর চেষ্টায় সংজ্ঞালাভ করিয়া অভাগিনী শুধু বলিলেন, "হা ভগবান্!"

সুনন্দা সুরেশ্বরীকে নেপথ্যে বলিলেন, "আপনি ওসব কথা নিয়ে আর আলোচনা করিবেন না। ঠাকুরাণীর শরীরের অবস্থা কতদূর খারাপ তা' দেখিতেই পাইতেছেন। এখন এই দুঃসংবাদ-গুলি না দিলেই ভাল ছিল।"

ইহার পর জয়া প্রকৃতিস্থা হইলে তাঁহার অপহরণের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা যাহা ঘটিয়াছে সুরেশ্বরী তাহা সুনন্দার নিকট জানিতে কৌতূহল প্রকাশ করিলেন। সুনন্দা বলিলেন, "এ সব কথা আমি নিজেই জানি না, আপনাকেও জানিতে বারণ করি। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট যে, মা আমার সাক্ষাৎ সতী।"

বেণী মামার ভিটায় যাহাতে প্রদীপ জ্বলে সুরেশ্বরী সেই জন্য জয়াকে সঙ্গে লইতে স্বামীর নিকট প্রস্তাব করিলে হৃষীকেশ কর্ণে অঙ্গুলী দিয়া কহিলেন, "আমায় নারীহত্যার পাতকভাগী করিও না।

এ অবস্থায় নড়াচড়া করিলে তোমার মামীর পীড়াবৃদ্ধি হইবে, এমন কি মৃত্যুও হইতে পারে।" আসল কথা, সঙ্গে এক আপদ জুটাইতে তর্কালঙ্কারের ইচ্ছা ছিল না। বেণী পণ্ডিতের ব্রাহ্মণী তাঁহার কে? উঁহার জন্য কেন তিনি মিছামিছি জাতিচ্যুত হইবেন?

সুরেশ্বরী তবু পীড়াপীড়ি করিলে হৃষীকেশ মনে মনে নারায়ণের নিকট প্রার্থনা করিলেন, জয়া যেন তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে রাজি না হন।

সুনন্দার নিষেধ না মানিয়া সুরেশ্বরী জয়াকে কাছিকাটায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। তাহা শুনিয়া জয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আর কোন্ সুখে সেখানে যাব?"

হৃষীকেশ হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তিনি যে ঈশ্বরেচ্ছায় জাতিরক্ষা করিয়া সস্ত্রীক কাছিকাটায় ফিরিয়া যাইতে পারিলেন এজন্য নারায়ণকে ভাল রকম ভোগ দিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

সর্দ্দার জম্‌সেদ খাঁ ফৌজদারের কার্য্যে ইস্তফা দিয়া যোদ্ধৃরূপে গৌড় বাদশাহ দাউদ শাহের সহিত রণক্ষেত্রে মিলিত হইলেন। বাদশাহের কাজ করিতে পারিলেই তাঁহার আনন্দ,—তা' শাসন বিভাগেই হউক বা সমর বিভাগেই হউক। বিশেষ, যেরূপ দিনকাল পড়িয়াছে তাহাতে প্রাণপাত করিয়াও যদি পাঠানরাজত্ব রক্ষা করা যায় সে কম সৌভাগ্যের কথা নহে। আর দুর্দ্দৈববশতঃ অসাফল্যই যদি হয় সেও সুখের, কারণ বাদশাহের জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত পাত করিয়া যে তৃপ্তি তাহা সামান্য নয়। বিশ্বস্ত বীর জম্‌সেদ খাঁকে পাইয়া দাউদ শাহও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অচিরে স্বীয় দক্ষতার ফলে সর্দ্দার সাহেব জনৈক প্রধান-সেনানায়ক পদে উন্নীত হইলেন। তাঁহাকে অবিশ্রান্ত ও অক্লান্ত-ভাবে সংগ্রামতৎপর দেখিয়া সেনানীগণের নিরাশহৃদয়ও উৎসাহে নৃত্য করিয়া উঠিল।

এদিকে জম্‌সেদ খাঁর স্থলে জেকি খাঁ ফৌজদার হইয়া আসিয়াছেন। তিনি ভালমানুষ হইলেও অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত বলিয়া শাসনকর্ত্তারূপে কোন যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। উজিরেরা চাহিয়াছিলেন একজন অনুগত সাদাসিধা লোক, যে নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য দেখাইবে না, উপরওয়ালার মর্জ্জি অনুসারে

চলিবে। জেকি খাঁ ঠিক সেইরূপ লোক। তিনি নিজের বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হইয়া দশের বুদ্ধি লইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বুদ্ধিদাতারা তাঁহারই তাঁবেদার, স্বার্থান্বেষী কর্ম্মচারী। জম্‌সেদ খাঁর আমলে যাহারা কখন মাথা তুলিবার সাহস পায় নাই, এখন নূতন ফৌজদারের সময়ে সুযোগ বুঝিয়া তাহারা আপন আপন অভিপ্রায়সিদ্ধি করিয়া লইতে লাগিল। জেকি খাঁ তোষামোদ বড় ভাল বাসিতেন। মন্দ লোকদের তাই খুব সুবিধা হইল। শক্তি যেখানে, চাটুকার সেখানে। ফৌজদারকে ঘিরিয়া চাটুকারদের দল খুব ঘ্যান্ ঘ্যান্—ভন্ ভন্ আরম্ভ করিয়া দিল। স্তব স্তুতি ও ভোজ্যাদিতে দেবতারা তুষ্ট! জেকি খাঁ তো সামান্য ফৌজদারমাত্র। তিনি দুরভিসন্ধি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে নিয়ত তোষামোদ ও ভেট পাইয়া তাহাদিগকে ঈপ্সিত বর দিতে লাগিলেন। দেখিয়া শুনিয়া অনেক ভালমানুষও ফৌজদারের কুঠিতে সেলাম বাগাইতে ও ধর্‌না দিতে গেল। কেননা, ফৌজদারের জানিত ব্যক্তি হইলে দুষ্ট লোকে বা গোয়েন্দারা হঠাৎ কোন উপদ্রব করিতে সাহসী হয় না। জম্‌সেদ খাঁর সময়ে এ সব ল্যাঠা ছিল না। এখন এই বাজে কাজই একটি প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইল।

জেকি খাঁ ফৌজদার হইয়া আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে জলিল খাঁকে মুক্তিদান করেন। কিন্তু জলিল তাহার বন্ধু খলিল প্রভৃতি কয়েদ থাকিতে আপনি খালাস হইতে চাহিল না। সে ফৌজদারকে জানাইল, "আমার নিরপরাধ সঙ্গীগণ আমারই জন্য শাস্তিভোগ

করিতেছে। আমি একা মুক্ত হইতে চাহি না। যদি আপনি তুষ্ট হইয়া আমাকে ছাড়িয়া দেন, তবে মেহেরবাণী করিয়া ইহা-দিগকেও ছাড়িয়া দিন। আমরা চিরকাল আপনার গুণগান করিব।" জেকি খাঁ ভাবিলেন, "এই জলিলের জন্যই জম্‌সেদ খাঁর ফৌজদারি ছুটিয়া গেল। কাজ কি বাপু, আমার গণ্ডগোলে? এ লোকটা একা খালাস হইতে চাহে না। ওকে দলশুদ্ধই ছেড়ে দিই। একটা ছাড়া একশ' লোক খালাস হ'লে এমন কি বায় আসে?" খাঁ সাহেব ফৌজদারি বজায় রাখিতে ব্যস্ত। অতএব তিনি জম্‌সেদ খাঁর মত 'বেকুবি' না করিয়া জলিলকে তাহার ইয়ারদের সহিত গারদ হইতে মুক্তি দিলেন।

খালাস পাইয়া জলিলের সঙ্গীরা তাহাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইল। জলিল তাহাতে বাধা দিয়া বলিল, "ইহাতে বাহাদুরি কি আছে? তোমরা আমার দোস্ত। আমার জন্য এত কষ্ট সহিয়াছ। তোমাদিগকে ছাড়িয়া আমি কি একা খালাস হইতে পারি?" বাড়ী গিয়া জলিল কৃতজ্ঞতাস্বরূপ প্রত্যেক অনুচরকে বিশ বিশ আস্‌রফি ইনাম দিল। নিবিড়কৃষ্ণ জলদের প্রান্তভাগে সময় সময় রজতরেখা পরিদৃষ্ট হয়, বিষধরের মস্তকেও মণি থাকে। মানুষ পূরা পিশাচ হয় না।

জলিল এখন হইতে বন্ধু খলিলের পরামর্শানুসারে ফৌজদারকে ভেট দিয়া খুসী করিতে লাগিল। খলিল বুঝাইয়াছিল, "যদিও ইহার তেমন প্রয়োজন নাই, কারণ জম্‌সেদ খাঁর মত জেকি খাঁ তোমাকে ঘাঁটাইতে সাহস পাইবে না,—তবু 'অধিকন্তু ন দোষায়'

বলিয়া হিঁদুদের একটা কথা আছে, ফৌজদারকে ভেট দিয়া আরো কিছু খোস্‌মেজাজে রাখিলে ভবিষ্যতে তোমার ইয়ারদের বিপদে অনেক ফল হবে।”

জলিল এখন হইতে আবার সবান্ধবে বে-পরওয়া হইয়া গেল। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের রূপবতী ললনারা ভয়ে কামালপুরের বিশ ত্রিশ ক্রোশ জমি ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

জেকি খাঁ নামে ফৌজদার। তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাই প্রকৃতপক্ষে হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা। তাহারা খাঁসাহেবকে যেমন বুঝাইত তিনি সেইরূপই বুঝিতেন। কাজেই অনেক অন্যায় হুকুমে ও পরওয়ানায় তিনি নামসহি করিয়া যাইতেন। প্রজারা তাঁহার উপর বিরূপ হইল, পরগণার পর পরগণা বিদ্রোহী হইল। কর্ম্মচারীদিগের আরো সুবিধা। তাহারা এই সুযোগে বেশ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইল ও ভয়ানক উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়া দিল। প্রজাদের স্বজাতিরাই প্রকৃত অত্যাচারী হইলেও হতভাগ্য জেকি খাঁরই অত্যাচারী বলিয়া অপবাদ রটিল।

রাজীব সাহা ও আল্‌ফুমিঞা প্রভৃতি বিবেকবিরহিত ঐশ্বর্য্যকামী ভূস্বামীগণ জম্‌সেদ খাঁর আমলে উচ্ছৃঙ্খলতার কোনরূপ সুযোগ না পাইলেও জেকি খাঁকে নানারূপ স্তোকবাক্যে ও উপঢৌকনে তৃপ্ত করিয়া সোৎসাহে প্রজার রক্তশোষণ করিতে লাগিলেন ও দুর্ব্বল পারিপার্শ্বিক জমিদারদিগের সর্ব্বনাশের উপর আপনাদের বিভবের প্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন। কুচক্রী কূটবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের এখন অব্যাহত প্রতাপ, শান্ত শিষ্ট ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি-

দিগের পরাভব। সায়েস্তা করা শাসনের নামান্তর হইল, প্রজার প্রতি অবিশ্বাস ও অত্যাচার রাজধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল, যথেচ্ছচারের ভয়ে সুবিচার দিল্লীতে আশ্রয় লইল। প্রজারা এখন হইতে সতত শঙ্কিত রহিল, কিন্তু সন্তুষ্ট রহিল না। পারিষদেরা জেকি খাঁকে বুঝাইল, শাসন প্রণালীর মূলসূত্র রাজশক্তির ভয়। তাঁহার কর্ম্মচারীরা এক একজন জবরদস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফৌজদার। তাহাদের অত্যাচারে, উৎপীড়নে প্রজারা 'ত্রাহি' 'ত্রাহি' রব করিতে লাগিল ও শান্তির আশায় সতৃষ্ণনয়নে মোগলের দিকে চাহিয়া রহিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ সিংহের সহিত শ্রীপুরের বনে বাস করিতে করিতে বেণীমাধব শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, এই দস্যুসর্দ্দারের দল সাধারণ দস্যুদিগের হইতে ভিন্ন প্রকৃতির। ইহারা অনর্থক পরপীড়া জন্মায় না, অনাবশ্যক লোকহত্যা করে না, দুষ্টের ধন কাড়িয়া লয়, সাধ্যমত পরের উপকার করে। প্রবলেরই ইহারা প্রধান শত্রু। ক্রমে বেণী রায়ের সহিত গোবিন্দ সিংহের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা দাঁড়াইল।

দলপতি তাঁহাকে প্রথম হইতেই ভালবাসিতেন। বোধ হয় ইহকালের সকল পরিচয় পূর্ব্বজন্মসম্বন্ধী। তাই প্রথম দর্শনেই কাহাকেও ভাল লাগে, কাহাকেও শত্রু বোধ হয়। একদিন সর্দ্দার গোবিন্দ সিংহ তাঁহার পূর্ব্বকথা বলিতে বলিতে বেণীকে কহিলেন, "ভাই, তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মন তোমার প্রতি কেমন আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমার একটি ছোট ভাই ছিল। সে ঠিক্ তোমারই মত দেখিতে। যতবার তোমাকে দেখি ততবার মনে হয় আমি আমার সেই ভাইটিকে দেখিতেছি। তুমি আমার সঙ্গে থাকিবে ?"

"আপাততঃ আছি বৈ কি ? এই বন ছাড়িয়া যাইতে আমারও ইচ্ছা করে না, দাদা !" এখন হইতে বেণীমাধব গোবিন্দ সিংহকে 'দাদা' বলিয়া ডাকিতেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ সিংহ সুলেমান করাণীর আমলে পাঠানদিগের কৃত অত্যাচার অবিচার যখন উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া বেণীমাধবের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ধরিতেন তখন যুবকের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে তপ্ত শোণিতস্রোত বহিতে থাকিত, হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইত, ইচ্ছা হইত তদ্দণ্ডেই পাষণ্ডদিগকে উচিত শিক্ষা দেন। তিনি যখনই শুনিতেন, অনেক পাষণ্ড হিন্দুকে বলপ্রয়োগে মুসলমান করিতেছে, সতীর সতীত্ব নাশ করিতেছে, অরাজকতা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে তখনই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। রাত্রে সুপ্তাবস্থায় সেই সব অত্যাচার চক্ষের উপর দেখিতে পাইয়া তিনি লাফাইয়া উঠিতেন, ভালরূপ নিদ্রা হইত না। এইরূপে দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল। গোবিন্দ সিংহের সহিত বেণীমাধবের ক্রমে প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিল।

একদিন দলপতি বেণীকে কহিলেন, "ভাই, তুমি তো পণ্ডিত, শাস্ত্রদর্শী। বলিতে পার, আপৎকালের ধর্ম্ম কি?"

বেণী। আর্ত্তের রক্ষা।

গোবিন্দ সিংহ। কে তাহা করিবে? তোমাদের দেশে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম কে পালন করিবে?

বেণী। ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ। আপৎকালে একে অপরের ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে।

গোবিন্দ সিংহ। তবে তুমি তাহা কেন কর না?

বেণী। আমি এইরূপই কিছু করিব ভাবিতেছি।

গোবিন্দ সিংহ। তবে আমার বিদ্যা শিক্ষা করিবে কি?

বেণী। বেশ, তা' মন্দ কি ?

সেই হইতে বেণীমাধব গোবিন্দ সিংহের নিকট লাঠিখেলা, অস্ত্রবিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, মল্লযুদ্ধ ও বন্দুক চালনা প্রভৃতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহার অপরিসীম পারদর্শিতা দর্শনে সর্দ্দার পুলকিত হইলেন। একদিন বনপার্শ্বস্থ প্রান্তরে নিস্তব্ধ নিশীথে দলপতির অনুজ্ঞাক্রমে কৃত্রিম যুদ্ধ হইল। তাহাতে বেণীমাধব অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলে সর্দ্দার মুগ্ধ হইয়া কহিলেন, "ভাই, মনে করিয়াছিলাম, তোমার জ্ঞানই অগাধ, এ সব কাজে তুমি কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবে না। আজ আমার সে ভ্রম ঘুচিয়াছে। এখন হইতে আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, এই দুর্দ্দিনে তুমি বরেন্দ্র ভূমের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে পারিবে, আর্ত্তকে ত্রাণ করিতে পারিবে, তোমার সাহসে, বাহুবলে ও কৌশলে পাষণ্ডের ত্রাস জন্মিবে ও লোকে ধর্ম্মকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে করিতে পারিবে।"

* * * * *

এদিকে জয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। সুনন্দা অক্লান্তভাবে তাঁহার সেবা করিতেছেন। রোগিণীর সকল লক্ষণই খারাপ। তার উপর তিনি ঔষধ সেবন করেন না, জীবনের মায়া একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

একদিন জয়া বলিলেন, "মা নন্দা, তুমি আমার জন্য এত কর্‌ছ কেন ? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সুনন্দা। ও কথা বল্‌বেন না, মা! আপনি নিশ্চয়ই সেরে উঠ্‌বেন।

জয়া। মিথ্যা বুঝ দিয়া আর কি হবে মা? আমি নিজেই বুঝ্‌তে পাচ্চি আমার সময় নিকট হয়েছে। নন্দা, বড় সাধ ছিল, মরিবার পূর্ব্বে জন্মের মত একবার শেষ দেখা দেখ্‌তে পাব। অদৃষ্টদোষে তা'ও বুঝি হ'ল না।

সুনন্দা। মা, আপনার মত সতীর শেষ ইচ্ছা যদি পূর্ণ না হয় তবে ধর্ম্ম মিথ্যা হবে, শাস্ত্র মিথ্যা হবে। আপনি কোন চিন্তা কর্‌বেন না। নিশ্চয়ই তাঁর দেখা পাবেন।

জয়া। তাই যেন হয় নন্দা!

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

গোবিন্দ সিংহের নানা স্থানে গুপ্তচর থাকিত। একদিন সন্ধ্যার সময় তাহাদের কেহ সংবাদ দিয়া গেল, "পোতাজিয়ার চণ্ডীপ্রসাদ রায়, সেরপুরের যুগলকিশোর সান্ন্যাল প্রভৃতি অনেক ব্যক্তিকে ফৌজদার বিনা অপরাধে বন্দী করিয়াছেন। তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকাশ্য প্রমাণ না থাকিলেও জেকি খাঁর সন্দেহ হইয়াছে, ইঁহাদের দ্বারা দেশের শান্তিভঙ্গ হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা বর্ত্তমান আছে। লোকে বলিতেছে, কোন শত্রুর চক্রান্তে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে; দুষ্টের দমনের জন্য যে একটি প্রবল দল ছিল ফৌজদার তাহাও ভাঙ্গিয়া দিলেন; প্রজাদিগের রক্ষার আর কোন উপায় রহিল না।"

গোবিন্দ সিংহ তখন রুগ্নশয্যা হইতে সবে উঠিয়াছেন। তাঁহার শরীর খুবই দুর্ব্বল। তিনি এই সংবাদ শুনিয়া কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া পরমুহূর্ত্তেই হুঙ্কার দিয়া আপনার দলের সকলকে আহ্বান করিলেন। তাহারা সমবেত হইলে তিনি কহিলেন, "আজ অবিলম্বে তোমাদিগকে সরকারি গারদ আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সেখানে আমার পরমাত্মীয় চণ্ডীপ্রসাদ রায়কে ফৌজদার অন্যায়ভাবে আটক করিয়া রাখিয়াছে। এই চণ্ডীর বাড়ীতে আমি আহত পিতার সহিত আশ্রয় লইয়াছিলাম!

চণ্ডী তখন ছেলেমানুষ। সে আমাকে না চিনিলেও আমি তাহাকে ভুলি নাই। স্থির জানিও, তাহাকে উদ্ধার না করিয়া আমি জলবিন্দু স্পর্শ করিব না। কেমন, তোমরা প্রস্তুত ?”

সকলেই সমস্বরে তাহাতে সম্মতি জানাইল, কিন্তু দলপতিকে যাইতে বারণ করিল। বেণী রায় বলিলেন, “আজ বড়ই ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। আপনার যাওয়া ঠিক্ হইবে না। এ কাজ আমরাই উদ্ধার করিয়া আসিতে পারিব।”

গোবিন্দ সিংহ। ভাই, বুড়া হাড়ের জন্য বেশী চিন্তা করিও না। চণ্ডীকে আমি নিজে খালাস করিতে না পারিলে আমার মনের তৃপ্তি হইবে না।

গোবিন্দ সিংহ স্থিরসঙ্কল্প, কোন নিষেধ মানিলেন না। তখন বেণী রায় বলিতে লাগিলেন, “সংবাদদাতার মুখে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে আমার মনে হয় শুধু চণ্ডীপ্রসাদ কেন, কারারুদ্ধ সকল ব্যক্তিকে মুক্তিদান করা সঙ্গত। তাহাতে আমাদের লাভ যথেষ্ট। যদি আমরা বন্দীদিগকে উদ্ধার করিতে পারি তাহা হইলে তাহারা কোনমতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। কারণ, তাহাদিগের পুনরায় গ্রেপ্তার হইবার ও গুরুতর দণ্ড ভোগ করিবার বিশেষ ভয় রহিবে। এমতস্থলে যদি তাহাদিগকে এই বনে আশ্রয় দিবার প্রস্তাব করা যায় তবে তাহারা সানন্দে আমাদের অনুগমন করিবে। মুক্তির জন্য ও আশ্রয়লাভের জন্য তাহারা উভয়তঃ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিবে। ভাবিয়া দেখুন, এইরূপে দল পুষ্ট করায় লাভ কত। আমাদের

বর্দ্ধিত শক্তির নিকট অত্যাচারীদের শক্তি ক্ষীণ হইবে, দুর্ব্বৃত্ত-দিগের যথেচ্ছচারিতার স্রোত রুদ্ধ হইবে, তাহারা আর যাহা খুসী তাহা করিতে পারিবে না। তাহাদিগের কার্য্যে বাধা দিবার জন্য এক বিরাট্ সম্প্রদায় আছে জানিলে তাহাদের অত্যাচার অনেক কমিবে। তাই বলি, যখন সরকারি কারাগার আক্রমণ করাই স্থির হইল তখন সকল কয়েদীকে মুক্ত করাই সঙ্গত নয় কি ?”

গোবিন্দ সিংহ এই প্রস্তাব সোৎসাহে অনুমোদন করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া দস্যুগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কারাগার অভিমুখে যাত্রা করিল। বেণীমাধবও তাহাদের সঙ্গে চলিলেন।

নিবিড় নিশীথে কারাগারের প্রহরীরা নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছিল। কেহ ঝিমাইতেছিল, কেহ ঘুমাইতেছিল, কেহ বিরহিণী প্রণয়িনীর সহিত মিলনের সুখস্বপ্ন দেখিতেছিল। সদর ফাটকের দুইজন সান্ত্রী সজাগ থাকিয়া প্রহরা দিতেছিল। তাহাদের একজন অন্যতমকে বলিল, “এ ভজন সিং, ইধার কোই আদ্‌মি আ রহা হ্যায় ?” ভজন সিং বলিল, “সাচ্‌মুচ্ ভাইয়া,—কোই শালা চোট্টা নিকাল্ যা রহা হ্যায়,—এ, হে, কো হ্যায় ?”

আর কো হ্যায় ? আক্রমণকারীরা যুগপৎ তাহাদিগের উপর লাফাইয়া পড়িল। যাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল তাহারা উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে উহারা তাহাদের বন্দুক ও তলোয়ার কাড়িয়া লইল।

কারাধ্যক্ষ সরকারের জন্য প্রাণপণে লড়িয়া নিহত হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর আর কয়েকজন হতাহত হইতেই অবশিষ্ট সান্ত্রীরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। কারাগারের চত্বরের মধ্যে যে সব সিপাহী প্রহরা দিতেছিল গোলযোগ শুনিয়া তাহারা সঙ্গীদিগের সাহায্যে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সকলে যাহা করিল উহারাও তাহাই করিল, অর্থাৎ পরিপাটিরূপে চম্পট দিল। গোবিন্দ সিংহ ও বেণী রায় তখন প্রত্যেক কক্ষ হইতে বন্দীগণকে মুক্ত করিলেন। মুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে চণ্ডীপ্রসাদকে দেখিয়া দলপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন।

তাঁহার আদেশক্রমে বন্দীরা তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে বহু গ্রাম ও প্রান্তর অতিক্রম করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইলে সকলে শ্রীপুরের বনের ভিতর প্রবেশ করিলেন। তখন গোবিন্দ সিংহ কহিলেন, "আজ আপনারা এই বনে আমার অতিথি।"

চণ্ডীপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ আমরা যাঁহার কৃপায় কারামুক্ত হইলাম, তাঁহার নাম জানিতে পারি কি?"

গোবিন্দ সিংহ। চণ্ডী, সে তোমাদেরই আশ্রিত—গোবিন্দ সিং।

দস্যুসর্দ্দার গোবিন্দ সিংহের নাম সে অঞ্চলে সকলেই জানিত। মুক্ত ব্যক্তিরা সবিস্ময়ে ও সকৌতূহলে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সকলের চেয়ে বিস্মিত হইলেন চণ্ডীপ্রসাদ রায়। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "ইনি আমাকে ভাল রকমই চেনেন দেখিতেছি। অথচ ইঁহার সঙ্গে আর কখন দেখা হইয়াছে বলিয়া মনে তো পড়ে না।"

এমন সময়ে গোবিন্দ সিংহ কথন কি ভাবে চণ্ডীপ্রসাদের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিতে লাগিলেন।

কথা সাঙ্গ হইলে দলপতি বিশ্রাম করিতে গেলেন। কিন্তু সেই দিনই দ্বিপ্রহরে তাঁহার খুব জ্বর আসিল।

বেণী রায় তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। চণ্ডী তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। যুগলও সঙ্গে আছেন। এ কথা সে কথার পর চণ্ডীপ্রসাদ কহিলেন, "আমি ও যুগল দা একবার পোতাজিয়ায় যাইতে চাই।"

গোবিন্দ সিংহ। গ্রেপ্তার হইলে জেকি খাঁ কি করিবে জান তো ভাই?

চণ্ডী। কাতল্; কিন্তু আমরা ছদ্মবেশে যাইব।

যুগল। কাতলেই বা ক্ষতি কি? মৃত্যুর মত স্থির কিছু নাই, তা' যে ভাবেই হউক। আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গোবিন্দ সিংহ। স্ত্রীপুত্রকে দেখিতে ইচ্ছা হয়?

চণ্ডী। যুগলদা অবিবাহিত। তিনি যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে বিবাহ করিলে বিঘ্ন অনেক, তাই বিবাহ করেন নাই। আমার স্ত্রী পুত্রাদি থাকিলেও তাহাদের জন্য আমি বিশেষ চিন্তিত নহি।

গোবিন্দ সিংহ। (যুগলের প্রতি) আপনার ধর্ম্ম কি?

যুগল। আর্ত্তের ত্রাণ।

বেণী প্রশংসাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে যুগলের দিকে চাহিয়া রহিলেন। গোবিন্দ সিংহ বলিলেন, "চণ্ডী ও আপনি সমধর্ম্মী বুঝিতে

পারিতেছি। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন না জানিতে পারিলে আমি আপনাদিগকে বিপদের মুখে যাইতে দিতে পারিতেছি না।"

যুগল। তবে শুনুন। চণ্ডীর বাড়ীতে আমাদের এক বিপন্না ধর্ম্ম-মা আছেন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িতা তখন আমরা বন্দী হই। এখন তিনি কেমন আছেন তাহা জানিবার জন্য আমরা বড়ই উদ্বিগ্ন আছি।

গোবিন্দ সিংহ। উভয়ের ধর্ম্ম-মা? রুগ্না, বিপন্না কে এই রমণী?

যুগল ও চণ্ডী আর কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তাহাতে গোবিন্দ সিংহ বলিলেন, "আপনারা আমার শয্যাপার্শ্বে যাঁহাকে দেখিতেছেন তাঁহার সম্মুখে কোন কথা বলিতে দ্বিধাবোধ করিবেন না। ইনি আমার সহোদরতুল্য, পরম ধার্ম্মিক, পণ্ডিত বেণীমাধব রায়।"

যুগল ও চণ্ডী উভয়েই সহসা চমকিয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া দলপতি বলিলেন, "ইহার পরিচয়ে তোমরা এমন চঞ্চল হইয়া উঠিলে কেন?"

চণ্ডী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "আমাদের ধর্ম্ম-মা ইহারই হতভাগিনী স্ত্রী।"

ইহা শুনিয়া বেণীমাধব বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

তখন গোবিন্দ সিংহের অনুরোধে যুগল ও চণ্ডী জয়ার উদ্ধার হইতে আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা সবিস্তারে বলিতে লাগিলেন।

তাহাদের কথা শেষ হইলে গোবিন্দ সিংহ বলিলেন, "ভাই বেণী, তুমি এখনই পোতাজিয়ায় রওনা হও। চণ্ডী, তোমার ও সান্ন্যাল মহাশয়ের বাড়ী রক্ষা করিবার কিরূপ বন্দোবস্ত করিতে বল?"

চণ্ডী। কোন বন্দোবস্তই করিতে হইবে না। পোতাজিয়া ও সেরপুরের গ্রামবাসীদের মধ্যে একটি লোক জীবিত থাকিতে আমাদের বাড়ীর ভাবনা ভাবিতে হইবে না। কেবল মার জন্যই আমরা বড় উৎকণ্ঠিত আছি।

গোবিন্দ। সেজন্য বেণী নিজে যাইতেছে। (বেণীমাধবের প্রতি) ভাই, বৌমা সারিয়া না উঠা পর্য্যন্ত তুমি চণ্ডীর বাড়ী থাকিও। আমার কোন না কোন লোক রোজ তোমার সংবাদ লইবে। যখন যাহা দরকার হয় তাহাকে জানাইবে। তোমার গোবিন্দদার নিকট অভাব অসুবিধা জানাইতে লজ্জা করিও না, ভাই!

বেণী পোতাজিয়া অভিমুখে রওনা হইলেন। চিন্তায় ও আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার গতিশক্তি বৃদ্ধি পাইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

বেণীমাধব চণ্ডীপ্রসাদের বাড়ীতে পঁহুছিয়া দাসীর প্রমুখাৎ গৃহকর্ত্রীর নিকট আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি জয়ার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনতোষিণী প্রখররবিকর-শোষিতা পদ্মিনীর ন্যায় বিশীর্ণা। সুন্দরীর চোখে মুখে কালি পড়িয়া গিয়াছে। যে রূপের ভিতর তিনি পূর্ণিমার জ্যোৎস্না, পারিজাতের সুষমা, তিলোত্তমার সৌন্দর্য্য, কালিদাসের কবিত্ব দেখিতে পাইতেন, দেখিয়া আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিতেন, যাহাতে বর্ষার নিবিড়তা, শরতের কমনীয়তা, বসন্তের প্রফুল্লতা একাধারে বিরাজমান দেখিয়া পুলকে মগ্ন হইতেন এই কি সেই জয়া, এই কি সেই স্বর্ণলতা ?

এদিকে পতিবিরহবিধুরা মুমূর্ষা অভাগিনী আজ ভর্ত্তাকে অপ্রত্যাশিতরূপে সহসা দেখিতে পাইয়া আনন্দের আতিশয্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া বলিলেন, "নাথ, দেবতা এসেছ ?" স্বামী শিয়রে বসিয়া তাঁহার চূর্ণকুন্তলরাশি সরাইতে সরাইতে বলিলেন, "জয়া, এই যে আমি তোমার সম্মুখে! আর যে দেখা হইবে সে আশা ছিল না। এতদিন পরে ভগবান্ যদি তোমায় আবার মিলাইয়া দিলেন তো আর আমি তোমায় ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।"

জয়া আনন্দবিস্ময়বিজড়িতস্বরে বলিলেন, "আমায় চরণে স্থান দিবে?"

রোগিণী আবার মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হইতে দেখিয়া সুনন্দার ভয় হইল। তিনি পুত্রের দ্বারা বেণী-মাধবকে জানাইলেন, তাঁহার পক্ষে আপাততঃ রোগিণীর নিকটে না থাকাই ভাল। ঠাকুরাণীর অবস্থা যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে হঠাৎ এতটা আনন্দে কোনরূপ বিপদ হইতে পারে।

বেণীমাধব বাহিরের কক্ষে গেলেন। চণ্ডীপ্রসাদের পুত্র কবিরাজ মহাশয়কে ডাকিতে গেল। জ্ঞানলাভ করিয়া জয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "কোথায় তুমি, দেবতা?"

সুনন্দা কহিলেন, "ঠাকুর বাহিরে আছেন। আপনি একটুকু শান্ত হইলেই তিনি আবার আসিবেন।"

জয়া। নন্দা, তাঁকে দেখা, আবার দেখা, মা!

বেণীমাধব আসিলেন। তখন জয়া বলিলেন, "নাথ, আমি তোমারই আশীর্ব্বাদে ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারিয়াছি।"

বেণী। আমার হৃদয় তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া দিয়াছে, সতি!

জয়া। তোমার চরণদুটি আমার মাথার উপর রাখ, প্রভু!

বেণী যন্ত্রচালিতের মত তাহা করিলেন। তারপর জয়া অতিশয় কাতর কণ্ঠে কহিলেন, "দাসীকে এই চরণে জন্মে জন্মে স্থান দিও, নাথ!"

বেণীমাধবের হৃদয়ের সুপ্ত আবেগগুলি জাগিয়া উঠিতেছিল,

তিনি গদগদস্বরে কহিলেন, "জয়া, ইহকালে পরকালে আমি তোমারই।"

অভাগিনী এখন আর বিষাদিনী নহেন। তাঁহার মুখমণ্ডল পুলকে প্রফুল্ল হইয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন, "হৃদয়সর্ব্বস্ব, আমি সব হারাইয়া, সব খোয়াইয়াও যে তোমার করুণায় বঞ্চিত হই নাই, ইহাই আমার পরম লাভ।"

বেণীমাধবের একবার মনে হইল, জয়া বুঝি বাঁচিবে, আবার অনুমান হইল, হয়ত ইহা নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের শেষ দীপ্তি, ক্ষণিক, ম্লানোজ্জ্বল। পরবর্ত্তী ধারণাই ঠিক্ হইল। জয়ার জীবনীশক্তি দ্রুতভাবে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। তিনি এবার অতি মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "নাথ, আমি চলিলাম,—বিমলাকে দেখিও,—আশীর্ব্বাদ কর, পরজন্মে যেন তোমাকে পাইয়া না হারাই।"

ইহার পর জয়ার বাক্‌রোধ হইল। তাঁহার অঙ্গ অসাড় ও চক্ষুতারকা স্থির হইল, জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল। বেণীমাধবের চিত্ত সংযমের রাশ আর মানিল না। তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিলেন।

হায় মানুষের সুখ! অনন্ত দুঃখের ঘনান্ধকারে চপলার বিকাশের মত কত ক্ষণিক, কত অস্থির তুই! চপলা এই হাসে, এই মিলায়, আঁধার বাড়াইয়া দেয়; মানুষের সুখও সেইরূপ,—এই আসে, এই যায়, দুঃখ বাড়াইয়া যায়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জয়ার চিতা জলিতেছে ধূ ধূ—ধূ ধূ—ধূ ধূ।

যে কখন সম্পদে রঙ্গিনী, বিপদে সঙ্গিনী, আদরের আদরিণী সোহাগিনী প্রণয়িনীর কুসুমকোমল দেহলতা পুড়িয়া ছাই হইতে দেখিয়াছে, যে কখন প্রাণবল্লভ হইয়া শ্মশানে এমন হৃদয়প্রতিমার চারু মুখে অগ্নিসংযোগ করিয়াছে, সেই জানে প্রেয়সীর চিতা যখন জ্বলিয়া উঠে ধূ-ধূ-ধূ-ধূ-ধূ-ধূ তখন বুকের পরতে পরতে রাবণের চিতা কিরূপে জ্বলিতে থাকে ধূ-ধূ-ধূ-ধূ-ধূ-ধূ,—মৃত ও জীবন্ত কেমন করিয়া সমকালে পুড়িতে থাকে ধূ ধূ—ধূ ধূ—ধূ ধূ। সুখে যে প্রফুল্লতা, দুঃখে যে সান্ত্বনা, সেবায় যে অনুরাগ, প্রেমে যে আত্ম-বিস্মৃতি, রঙ্গে যে কৌতুকময়ী, সহিষ্ণুতায় যে ধরিত্রী, সংসারে যে লক্ষ্মী, গৃহে যে অন্নপূর্ণা, স্বামীর যে সৌভাগ্য, পরিজনের যে সন্তোষ, দর্শনে যে অতৃপ্তি, অদর্শনে যে চিন্তা, সতীত্বে যে গরীয়সী, মহত্ত্বে যে মহীয়সী, ধমনীর যে রক্ত, অস্থির যে মজ্জা, দেহের যে অৰ্দ্ধ, হৃদয়ের যে সর্ব্বস্ব এমন প্রিয়তমাকে চিতাভস্মে পরিণত করিয়া যে নিজে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে তিলে তিলে পুড়িতেছে সেই জানে শ্মশানের দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর মর্ম্মভেদী। যাহার সহিত ক্ষণবিরহ সহিত না, আজ তাহার সহিত চিরবিচ্ছেদ ঘটিল; যাহা প্রেয়ের অধিক প্রেয়, শ্রেয়ের অধিক শ্রেয়, আজ তাহা পুড়িয়া ছাই হইল; পঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিলাইল; রহিল, শোকের তীব্রস্মৃতি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

জয়ার শোকে বেণীমাধব চেতনাশূন্য কঙ্কালের ন্যায়, দিবাকর-হীন সৌরজগতের ন্যায়, রাহুগ্রস্ত নিশাকরের ন্যায়, প্রতিমাশূন্য দশমীর মণ্ডপের ন্যায়, অপ্রবুদ্ধপ্রত্যয় দেশের ন্যায় থাকিয়া না থাকার মত হইলেন, তাঁহার বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। পরক্ষণেই, যে পাষণ্ডদিগের অত্যাচারে তিনি প্রেমপ্রতিমাকে অকালে বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইলেন তাহাদের রক্তে বসুন্ধরা রঞ্জিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রতিহিংসায় তাঁহার প্রত্যেক শোণিতবিন্দু উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সেই সঙ্গে হৃদয়ে দুস্কৃতদলনের তীব্র বাসনা জাগিয়া উঠিল। মার মূর্ত্তি আবার তাঁহার মনোমধ্যে সপ্রকাশ হইল। যে চকমকির পাথর ঘর্ষণের অপেক্ষায় ছিল তাহা জ্বলিয়া উঠিল, অরণির অগ্নির অব্যক্তস্বরূপ ব্যক্ত হইল, অনলগর্ভ গিরির গর্ভস্থ অগ্নি বাহির হইয়া পড়িল। চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, তাহার মধ্যে একটি বিদ্যুতের জন্ম হইল, কালধর্ম্মে একটি ধূমকেতুর, একটি উল্কাপিণ্ডের সৃষ্টি হইল, সাত্বিক পণ্ডিত বেণীমাধবের রাজসিক স্বরূপ বিকশিত হইল। ইহাতে বৈচিত্র্য কি? জগৎ নিত্য-পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনই তাহার ধর্ম্ম। মানুষের জীবনও সেইরূপ। আজ যেখানে সুপ্তি, কাল সেখানে জাগরণ; আজ যেখানে শান্তি, কাল সেখানে চাঞ্চল্য; আজ যেখানে বীণার তান, কাল সেখানে দুন্দুভিনিনাদ; আজ যাহারা নির্ব্বিরোধী, কাল তাহারা দুর্দ্ধর্ষ। পাঠানদিগের রাজত্বের শেষকালে যে সকল অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ হয় তাহার প্রতিকারকল্পে যে শক্তির উদ্ভব হয় তাহারই পূর্ণ পরিণতি বেণী রায়।

বেণীমাধব গোবিন্দ সিংহের কুটীরে উপস্থিত হইলে দলপতি, যুগল ও চণ্ডী তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পরে তাঁহার নিকট সবিশেষ শুনিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে দলপতির ব্যাধি দিন দিন গুরুতর হইতে লাগিল। প্রথমে কেহ পীড়া সাঙ্ঘাতিক মনে না করিলেও কিছু দিন পরে বুঝা গেল, সর্দ্দার গোবিন্দ সিংহ ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন না। রোগী নিজেও আপনার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই একদিন সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমার মৃত্যুর পর তোমরা ছত্রভঙ্গ হইয়া না পড় এই আমার ইচ্ছা। উপস্থিত আমার দলে যত লোক আছে তন্মধ্যে বেণীমাধব জ্ঞানে, সাহসে ও বুদ্ধিতে, সর্ব্বপ্রকারে দলপতি হইবার উপযুক্ত। তাহাকেই আমি তোমাদের নেতৃত্বে নিযুক্ত করিলাম। আমার প্রতি তোমরা যেরূপ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া আসিতেছ, বেণীর প্রতিও সেইরূপ করিবে।"

ইহার কয়েক দিন পরে গোবিন্দ সিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার জন্য সকলেই গভীর শোকপ্রকাশ করিল। তাঁহার সহৃদয়তা ও সস্নেহ ব্যবহার স্মরণ করিয়া অনেকেই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না। বেণীও অগ্রজের বিয়োগদুঃখ অনুভব করিলেন।

এখন হইতে তাঁহাকেই দলপতির দায়িত্ব স্কন্ধে লইতে হইল।

দ্বিতীয় খণ্ড

বিদ্যুৎস্ফুরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দলপতি হইয়া বেণী রায় দলসংস্কারে ব্রতী হইলেন। যাহাদের নীতি তেমন উন্নত ছিল না তাহারা তাঁহার সংস্পর্শে সন্নীতিপরায়ণ হইল, যাহাদের আদর্শ সুস্পষ্ট বা মহৎ ছিল না তাহারা একটা উজ্জ্বল উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। বেণীমাধব তাঁহার সঙ্গীদিগকে কয়েকটি অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিলেন। তন্মধ্যে যাহা প্রধান তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ;—

(১) লক্ষ্য, আর্ত্তের ত্রাণ ও দুষ্টের দমন ; পণ, জীবন ; ইহাতে হিন্দুমুসলমান বিচার করা হইবে না।

(২) কোন স্ত্রীলোক বা বালকের উপর কেহ অত্যাচার উৎপীড়ন করিতে পারিবে না ; তাহাদিগকে কেহ ধরিয়া লইতে পারিবে না বা তাহাদের অলঙ্কার স্পর্শ করিতে পারিবে না।

(৩) বরেন্দ্রভূমে কাহাকেও হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইবে না।

এখন হইতে ডাকাতির সুর বদলাইয়া গেল, সচরাচর যাহাকে ডাকাতি বলে তাহা উঠিয়া গেল। বেণীরায়ের দল অনেক ডাকাইতের উপর ডাকাতি করিয়া তাহাদিগকে উত্যক্ত করিয়া বরেন্দ্র ভূমির বাহির করিয়া দিল। বহু অনাথ ও অনাথা এবং নিঃস্ব পরিবার বেণী রায়ের নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতে লাগিল। কোন স্থানে স্ত্রীলোকের উপর বা দুর্ব্বলের উপর

অত্যাচার হইতেছে জানিতে পারিলেই তাঁহার দল সেখানে অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া দুষ্কৃতের দণ্ড বিধান করিত। সুলেমান করাণীর আমলে কালাপাহাড়ের অত্যাচার প্রবল ছিল। হিন্দু নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিত না। দাউদ শাহ সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বীর পুরুষ, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুকে দমন করিতে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রজাপীড়ন করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। তবু তাঁহার রাজ্যে কোন কোন মুসলমান জমিদার হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিত। বেণী রায় ইহাদের যমস্বরূপ হইলেন। কারাগার হইতে মুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যুগল ও চণ্ডী শিক্ষায় ও সাহসে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা নবীন উদ্যমে লোকসংগ্রহের কাজে বেণী রায়ের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেক দক্ষ বলিষ্ঠ যুবকের দ্বারা পূর্ব্ব দল পুষ্ট হইয়া উঠিল। অত্যাচারী ব্যক্তিগণের হৃদকম্প এবং আর্ত্ত ও নিপীড়িতের আনন্দের পরিসীমা রহিল না।

শ্রীপুরের বনে আর স্থানসঙ্কুলান হয় না। বিশেষ, নদনদী খালবিলে ভরা বরেন্দ্রভূমে কোন নদীর ধারে থাকিয়া আক্রমণ করা ও সরিয়া পড়া খুব সহজ। অনেক দেখিয়া শুনিয়া বেণী রায় কৈত চরে বাস করা স্থির করিলেন। এই চর চলন বিলের মধ্যে, চারিদিকে জঙ্গলে ঘেরা, উহাতে মনুষ্যসমাগমমাত্র নাই। এখানে সদলবলে আসিয়া বেণী রায় মৃত্তিকার নিম্নে এক বৃহৎ সুড়ঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া উহার সহিত আপনার কুটীরের সংযোগ সাধন করিলেন। সেই সুড়ঙ্গের ভিতর অস্ত্রশস্ত্ররক্ষার ও সময় মত সকল সমেত

আত্মগোপন করিয়া থাকার বন্দোবস্ত করা হইল। অনেকগুলি দীর্ঘ পান্সী তৈয়ার হইয়া আসিল। চরের ভিতর এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। একজন তান্ত্রিক পুরোহিত দেবীর পূজারি নিযুক্ত হইলেন।

বেণী রায়ের চর সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। মাঝি, পানওয়ালী, বৈষ্ণবী, বারবনিতা, দোকানদার, নাপিত, মুস্কিল আসান প্রভৃতি অনেকে তাঁহার গোয়েন্দার কাজ করিত। ইহাদের মুখে কোথাও কোন অত্যাচার উৎপীড়ন হইতেছে জানিতে পারিলে পণ্ডিত ডাকাইতের দল তাহা তৎক্ষণাৎ দমন করিত। ক্রমে উহাদের প্রতি লোকের সহানুভূতি বাড়িতে লাগিল।

জলিল ও খলিল প্রভৃতির উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য বেণী রায় প্রথম হইতেই অবসর খুঁজিতেছিলেন। এই দুর্ব্বৃত্তদিগের সহিত জেকি খাঁর ইদানীং মাথামাখি ভাব খুব বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা ফৌজদারের কুঠিতে কখনও নাচ তামাসা দেখিয়া বেড়াইত, কখনও আপনাদের বাড়ীতে মাইফিল মুজরা দিত, কখনও কোন তরুণীর উপর অত্যাচার করিবার সুযোগ খুঁজিত। কামালপুর হইতে জলিল ও খলিলকে ধরিয়া আনিতে বেণী রায় যুগল ও চণ্ডীকে সদলবলে পাঠাইয়া দিলেন।

তৃতীয় প্রহর রাত্রে কামালপুরের সদর ঘাটে পঁহুছিয়া চণ্ডী যুগলকিশোরকে বলিলেন, "যুগলদা, তুমি খলিলের বাড়ী আক্রমণ করিতে যাও, জলিল বেটার উদ্দেশে আমি যাইব।"

যুগল। কিন্তু দেখো যেন জ্যান্তে ধরিয়া আনিতে পার।

রাগ সামলাইতে না পারিয়া একেবারে মুণ্ডটা উড়াইয়া দিও না।

চণ্ডী। ভাল কথা মনে ক'রে দিয়েছ। বেটাকে ধ'রে এনে কৈতের চরে বলি দেওয়া যাবে, কি বল?

যুগল। সেই ভাল।

যথাসময়ে জলিল ও খলিলের বাড়ী যুগপৎ আক্রান্ত হইল। চণ্ডী জলিল খাঁর বাড়ী ঘেরাও করিয়া কাহাকেও বাহিরে যাইতে দিলেন না। সর্দ্দারের লোকজন এই অতর্কিত আক্রমণের বেগ সহিতে না পারিয়া আত্মসমর্পণ করিলে চণ্ডী তাহাদিগকে বাঁধিবার হুকুম দিলেন। জলিলকে তিনি নিজেই এমন কঠোরভাবে বাঁধিলেন যে বাঁধনের দাগগুলি বেত্রাঘাতে ফাটিয়া পড়ার মত দেখাইতে লাগিল। প্রহারের চোটে জলিল তাহার গুপ্তধন ও অন্যান্য বহুমূল্য রত্নসামগ্রী দেখাইয়া দিলে চণ্ডীর দলের লোকেরা তাহা চট্‌পট্‌ লুঠিয়া লইল।

তারপর চণ্ডী জলিলকে কহিলেন, "মনে পড়ে, খাঁ সাহেব, একদিন এই সদরঘাটে তুমি কাছিকাটার এক ব্রাহ্মণপত্নীকে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিলে, আমরা তাঁহাকে তোমার হাত হইতে উদ্ধার করি? সেই ঠাকুরাণী আমার ধর্ম্ম-মা। তাঁহার উপর যে অত্যাচার হইয়াছে আজ তাহার প্রতিশোধ লইব। এই রমণীদের মধ্যে তোমার স্ত্রীকে সনাক্ত কর।"

জলিল কোন উত্তর দিল না। চণ্ডী কহিলেন, "বটে, সনাক্ত করিবে না? ভাবিয়াছিলাম, শুধু তোমার স্ত্রীকে ধরিয়া

লইয়া যাইব। আচ্ছা, তা না হইল। এখানে যে সর্ব আওরৎ আছেন সবাইকে উলঙ্গ করিয়া লইয়া যাই।"

দস্যুরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। জলিলের চক্ষু দিয়া আগুনের ঝলকা বাহির হইতেছিল। সে চীৎকার করিয়া কহিল, "খবরদার, আওরতের ইজ্জত নষ্ট করিও না।"

চণ্ডী বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আওরতের ইজ্জতের জ্ঞান কবে হইতে হইল, খাঁ সাহেব? বেণী ঠাকুরের স্ত্রীকে ধরিয়া লইবার সময় এ আক্কেল তো ছিল না। তোমার মত পশুর মুখে ইজ্জতের কথা? হা—হা!"

আওরতেরা সম্ভ্রমনাশের ভয়ে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে এক বর্ষীয়সী রমণী বলিলেন, "আপনারা হিন্দু। স্ত্রীলোককে মা বহিনের মত দেখেন। আমাদের ইজ্জৎ নষ্ট করিবেন না। দোহাই আপনাদের।"

চণ্ডী তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলেন, "আমরা পণ্ডিত ডাকাইতের দলের লোক। হিন্দু হোক্, মুসলমান হোক্, কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করা আমাদের স্বভাববিরুদ্ধ, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। আমি কেবল ঐ পাষণ্ডকে বুঝাইতেছিলাম, নিজের জরু প্রভৃতির বেইজ্জতে প্রাণে যেমন ব্যথা লাগে, পরের জরু প্রভৃতির বেইজ্জতেও তেমনি লাগা উচিত। আপনারা খিড়কির দরজা দিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। কেহ আপনাদের ছায়াস্পর্শ করিবে না।"

বেণী রায়।

দস্যুরা চণ্ডীর ব্যবহারে প্রথমে স্তম্ভিত হইয়াছিল, এখন তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

রমণীরা চলিয়া গেলে চণ্ডী জলিলের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিলেন। নিজের বাড়ী চক্ষুর সম্মুখে এইরূপে পুড়িয়া ছাই হইতেছে দেখিতে দেখিতে জলিল দস্যুদিগের সহিত সদরঘাটে পঁহুছিল। সেখানে খলিল ও আর দুইটি দুর্ব্বৃত্তকে দেখিতে পাইয়া চণ্ডী জলিলকে কহিলেন, "খাঁ সাহেব, এই যে তোমার দোস্তরা তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। (খলিলের প্রতি) কি মিঞা সাহেব, চিনিতে পার কি ?"

খলিল কিছু বলিল না। জলিলের বাড়ী হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ দেখিয়া যুগল কহিলেন, "এ যে কুবেরের ভাণ্ডার দেখিতেছি।"

চণ্ডী কহিল, "দাদা, পাপীর হাতে ধন ছিল, আনা গেল। সৎকার্য্যে ব্যয় হবে। তুমিও কিছু এনেছ দেখিতেছি।"

যুগল। মিঞা সাহেবকেই যখন আনিলাম, তখন তার টাকা কড়ি আর রাখিয়া আসি কেন ?

অবশেষে ছিপ্ খুলিয়া দেওয়া হইলে উহা নক্ষত্রবেগে কৈত চরের অভিমুখে রওনা হইল। পরদিন প্রাতে তাহারা আড্ডায় পঁহুছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চণ্ডীর মুখে জলিল শুনিয়াছিল, উঁহারা পণ্ডিত ডাকাইতের দলের লোক। কিন্তু বেণী রায়ই যে পণ্ডিত ডাকাইত সে তাহা জানিত না। তবে যুগল ও চণ্ডী প্রভৃতি একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সম্মুখে তাহাকে ও তাহার দোস্তদিগকে হাজির করিয়া সসম্ভ্রমে কথা বলিতেছেন দেখিয়া সর্দ্দার ভাবিল, বোধ হয় এই ব্রাহ্মণই ইহাদের দলপতি।

যখন যুগল কহিলেন, "এই পাপিষ্ঠেরাই মাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল", তখন বেণী রায়ের চক্ষু ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ও তিনি বজ্রনির্ঘোষবৎস্বরে বলিলেন, "তোরাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্?"

যুগল ও খলিল এবার স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এই পণ্ডিত দলপতিই বেণী রায়। প্রতিহিংসার ভয়ে তাহাদের হৃদ্‌কম্প হইতে লাগিল। তারপর চণ্ডীর প্রস্তাবে স্থির হইল, সেই রাত্রেই পাষণ্ডদিগকে বলিদান করা হইবে। দণ্ডের কথা শুনিয়া জলিল ও তাহার দোস্তেরা শিহরিয়া উঠিল।

বেণীর আদেশে শীঘ্রই তাহাদিগকে স্নান করাইয়া আনা হইল ও যথাবিধি উৎসর্গ করা হইল। তান্ত্রিক পুরোহিত গদগদকণ্ঠে বলিলেন, "মা! মা!"

যূপকাষ্ঠের সম্মুখে আনীত হইলে খলিল বলিল, "কি, বন্দীকে বলি দিয়া বীরত্ব দেখাইবে? তোমাদের দলের সবাই বুঝি এমনি বীর!"

প্রত্যুত্তরে চণ্ডী কহিলেন, "অনেকগুলি বদমাইস মিলিয়া একটি নিদ্রিতা অসহায়া রমণীকে বাঁধিয়া লইয়া যাহারা বীরত্ব দেখাইয়াছে তাহাদের সহিত এইরূপই আচরণ করিতে হয়।"

জলিল এপর্য্যন্ত কিছু বলে নাই। সে এবার কহিল, "আমাদিগকে কাতল্ কর, কিন্তু বলি দিও না।"

চণ্ডী। সেকি, হাড়িকাঠে ছাগজন্ম সফল করিবে না?—(বাদ্যকরদিগের প্রতি) ওরে, বাজা, ঢাক বাজা!

যুগল বেণীকে কহিলেন, "আপনি স্বহস্তে এই পশুগুলাকে বলি দিন।"

বেণী। উহাদের মত ঘৃণিত নরাধমদের রক্তে আমার হস্ত কলুষিত করিব না। তোমরাই যা হয় কর।

তখন চণ্ডী ও যুগল জলিল প্রভৃতি চারিজন নরাধমকে বলিদান করিলেন। এইরূপে প্রতিহিংসা লইয়া বেণী রায়ের হৃদয়ের জ্বালা আজ কতক জুড়াইল।

ইহার দুই চারিদিন পরে যুগল ও চণ্ডী কামালপুর হইতে অনেকগুলি মুসলমানকে বদমাইস সন্দেহে ধরিয়া আনিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন দরবেশবেশী লোক ছিলেন। তাঁহার তুষারশুভ্র শ্মশ্রু, দীর্ঘায়ত দেহ। তিনি মুখে "আল্লা!" "আল্লা!" "খোদা!" "খোদা!" বলিতেছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারময়ী রাত্রি। সারি সারি স্থাপিত বধ্যমান ব্যক্তিগণ যূপকাষ্ঠের সম্মুখে রজ্জুবদ্ধ। তাহাদের ঘন ঘন শরীরকম্প ও হৃদ্‌কম্প হইতেছে। ভীত চকিত দৃষ্টিতে তাহারা হাড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আছে। তান্ত্রিক পুরোহিত আসব পান করিয়া রক্তলোচনে উৎসর্গের মন্ত্র পড়িতেছেন। সকলেই উন্মত্ত। পুরোহিত বলিলেন, "সময় উত্তীর্ণ হয়, বলি দাও।" ঢাকীরা ঢাকের কাঠি ঘুরাইতে লাগিল; কিন্তু বলির বাজানার শব্দ বাহির হইল না। তাহাদেরও মত্তাবস্থা। চণ্ডী বলিলেন, "যুগলদা, সবার আগে ঐ বড় দাড়ীওয়ালা দরবেশটাকে বলি দেওয়া যাক। তার পর তার চেয়ে ছোট দাড়ী, আরো ছোট দাড়ী, এমনি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া পর পর বলি দিব। কি বল?"

যুগলের সম্মতি পাইয়া চণ্ডী দরবেশকে ধরিয়া তাহার গলদেশ হাড়িকাঠের ভিতর চালাইয়া দিলেন। তান্ত্রিক পুরোহিত ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন, "মা, মা যবনমর্দ্দিনি!" দরবেশ অট্টহাস্য করিয়া গায়িতে লাগিলেন,

"নিবিড় আঁধারে মা, চমকে ও রূপরাশি!"

চণ্ডী ঘাতকের বেশে খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাহাকে বলি দিতে উদ্যত। মনুষ্যছাগগুলির সমস্বরে ধ্বনিত করুণ আর্ত্তনাদে দিঙ্মণ্ডল কম্পিত। এমন সময়ে বেণী রায় হুঙ্কার দিয়া "থাম!" "থাম!" বলিতে বলিতে সেখানে ছুটিয়া আসিলেন। দরবেশ তখনও গায়িতেছিলেন,

"নিবিড় আঁধারে মা, চমকে ও রূপরাশি!"

চণ্ডীর হাতের খড়্গ হাতেই রহিয়া গেল। বেণী দরবেশকে হাড়িকাঠ হইতে মুক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি মহাপুরুষ? আপনাকে এতদিন ধরিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। কোথাও আপনার দেখা পাই নাই। আপনার সঙ্গীতে কি এক সম্মোহনশক্তি আছে যাহা আমাকে পাগল করিয়াছিল, আমার জীবনের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিল! আজ আপনার মুখে আমি সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীতের ব্যাখ্যা শুনিব।"

পাঠকদিগের বুঝিতে বাকি নাই, দরবেশ প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত শ্মশানচারী গায়ক। কেহ তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিত, কেহ খ্যাপা সাধু বলিত। তিনি বেণী রায়ের কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "আলোর বিকাশ দেখিতে আসিলাম—কিন্তু এই কি সেই আলো?—শুনিয়াছি, বড় জ্ঞানী, বড় ধার্ম্মিক সে,—কোথায় সে, মা? হা-হা—নাই, কেউ এ শ্মশানে নাই,—সব ভূতপ্রেতকঙ্কাল!—আলো নাই—আঁধার—আঁধার—নিবিড় আঁধার—"

পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করিয়াও বেণী রায় খ্যাপা সাধুর নিকট অসম্বদ্ধ উক্তি ব্যতীত আর কিছুই শুনিতে পাইলেন না।

খ্যাপা সাধু বলিতে লাগিলেন, "মা, তোর এই অপমান! যে নামে কোন সাধক কোন দিন তোর পূজা করে নাই এখানে তোর সেই নাম শুনিলাম। কি লজ্জা—কি দুঃখ—কি মূঢ়তা! হিন্দুমুসলমান মার দুই চোখ,—এরা মার এক চোখ কানা করিতে বসিয়াছে।"

সাধু বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন।

বেণী তখন যুগল ও চণ্ডীকে আদেশ করিলেন, "এই রজ্জুবদ্ধ ব্যক্তিদিগের বন্ধন মুক্ত করিয়া উহাদিগকে কামালপুরে ছাড়িয়া দাও। আজ হইতে আর নরবলি হইবে না। মাকে হৃদয়ের শোণিত দিয়া পূজা করিতে হইবে, অন্য শোণিতে প্রয়োজন নাই। মা আর যবনমর্দ্দিনী নন, এখন হইতে তিনি শুধু রক্ষাকালী!"

মুসলমানের সহিত ধর্ম্ম লইয়া হিন্দু কোনদিন বিবাদ করে নাই। তাহারা রাজত্ব লইয়া রণক্ষেত্রে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, অত্যাচার অরাজকতার বিরুদ্ধে বীরদর্পে দাঁড়াইয়াছিল। যে সব অপরিণামদর্শী মুসলমান বাদশাহ ও শাসনকর্ত্তা হিন্দুর বুনিয়াদ ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহারা সকলেই ব্যর্থকাম হইয়াছিল। সহস্র নির্য্যাতনেও মুসলমানেরা হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ করিতে পারে নাই, বরং তাহারাই এদেশবাসী হইয়া গেল, এদেশের পরিচ্ছদের কতক কতক পরিবর্ত্তন করিয়া আব্বা-জাব্বা চোগা চাপকান বানাইল বা ধুতি চাদর পরিল, বীণ ভাঙ্গিয়া সেতার গড়িল, মল্লার ভাঙ্গিয়া মিঞা মল্লার করিল ও হিন্দীভাষা ভাঙ্গিয়া উর্দ্দ ভাষা গড়িয়া লইল বা বাঙ্গালাকেই মাতৃভাষারূপে গ্রহণ করিল, কেবল ধর্ম্মে উভয় জাতি পৃথক রহিয়া গেল। এহেন নিকটতম মুসলমানের প্রতি হিন্দু চিরকালই প্রতিবেশীসুলভ উদারতা ও সৌহার্দ্দ্য দেখাইয়া আসিয়াছে। যখনই এই সদ্ভাবের বিপর্য্যয় হইয়াছে তখনই তাহার মূলে কোন না কোন অত্যাচার প্রচ্ছন্ন থাকিতে দেখা গিয়াছে। বেণী রায়ের যবনমর্দ্দিনী কালী প্রতিষ্ঠার

মূলে দারুণ ব্যক্তিগত অত্যাচার নিহিত ছিল। কিন্তু যখন তিনি নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন তখন বিদ্বেষপ্রসূত যবনমর্দ্দিনী কালী নাম উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে সর্ব্বাপদ্‌নিবারিণী রক্ষাকালী এই সনাতনী আখ্যা প্রদান করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজীব সাহার বাড়ীতে কাল গোপীনাথের মহোৎসব। ফলাহারের নানা খাদ্যসামগ্রীতে ভাণ্ডার পূর্ণ। রাত্রি এক প্রহর অতীত হইলে দুই জন ব্রাহ্মণ অতিথি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সাহা মহাশয়ের দেওয়ান পরম বৈষ্ণব রাধাবল্লভ বসু তাঁহাদিগকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনারা বৈষ্ণব ?"

ব্রাহ্মণদ্বয় বলিলেন, "আমরা শাক্ত।"

রাধাবল্লভ। তবে অন্যত্র স্থান দেখুন।

প্রথম ব্রাহ্মণ। এই রাত্রে অন্ধকারে কোথায় যাই বলুন ?

রাধাবল্লভ। যেখানে খুসী যান, এখানে স্থান হইবে না।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। বাবুর সহিত দেখা না করিয়া কোথাও যাইব না। তাঁহাকে সংবাদ দিন।

রাধাবল্লভ। বৃথা গোল করিতেছেন। আপনাদিগকে আশ্রয় দেওয়া দূরের কথা, বাবু আপনাদিগের ছায়াস্পর্শও করিবেন না।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু যবন ফৌজদারের করস্পর্শে গৌরব বোধ করিতে পারেন ?

রাধাবল্লভ। রাধামাধব, এ সব কথায় আপনাদের প্রয়োজন কি ? কিষণ সিং, এই লোক দুটি ভালয় ভালয় না যায় তো এদের জোর ক'রে সদর দরজার বাহির ক'রে দাও।

প্রথম ব্রাহ্মণ। খবরদার!

রাধাবল্লভ। কি, এতদূর স্পর্দ্ধা! কিষণ সিং, এখনি হুকুম তামিল কর।

কিষণ সিং। হুজুর, ইন্ লোক ব্রাহ্মণ হ্যায়, হাম কোই ব্রাহ্মণ পর জুলুম নেই কর্ শক্তা।

রাধাবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "বটে, তুমি এতদূর নিমক হারাম? বেশ, আজ থেকে তুমি বরখাস্ত হইলে।"

কিষণ সিং। বাবু সাহেব, খুসীসে চলা যাতে হেঁ, লেকিন্ রাজপুতকো কভি নিমকহারাম নেহি কহিয়ে গা।

গোলযোগ শুনিয়া তিলকমালায় সুশোভিত রাজীব সাহা স্বয়ং সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেওয়ানের মুখে সবিশেষ শুনিয়া বলিলেন, "ইঁহারাই যাইতে অসম্মত হইতেছেন?"

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। হাঁ, বাড়ীর কর্ত্তার সহিত সাক্ষৎ না করিয়া আমরা কোথাও যাইব না।

রাজীব সাহা। আমারই এই বাড়ী। এখানে কোন কৃষ্ণদ্রোহীর স্থান হইবে না।

প্রথম ব্রাহ্মণ। আমরা শাক্ত, কিন্তু কৃষ্ণদ্রোহী নই। যে কৃষ্ণ সেই কালী।

কালীনাম শ্রবণমাত্র রাজীব সাহা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া "রাধে শ্যাম" বলিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে কহিলেন।

প্রথম ব্রাহ্মণ। এই অন্ধকারে রাত্রি দেড় প্রহরে আমাদিগকে কয়েক দণ্ড আশ্রয় দিবেন না? এই বুঝি আপনার "জীবে দয়া"?

রাজীব সাহা। কত শালা চোর ডাকাত রাতে সাধু সেজে আসে। বেরোও বলিতেছি। কোই হ্যায়?

এমন সময়ে প্রথম ব্রাহ্মণ সহসা বংশীধ্বনি করিলেন ও দেখিতে না দেখিতে সে স্থান পণ্ডিত ডাকাইতের দলে ভরিয়া গেল। ভয়চকিত দৃষ্টিতে রাজীব সাহা ব্রাহ্মণদ্বয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কে?"

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত ডাকাইতের লোক।

ইতিমধ্যে প্রথম ব্রাহ্মণের আজ্ঞায় দস্যুরা দেওয়ান ও রাজীব সাহাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া সাহা মহাশয়ের বাড়ী লুঠ করিতে লাগিল। লুঠের পর তাহারা রাজীব সাহাকে ও রাধাবল্লভকে ধরিয়া লইয়া চলিল। রাজীব সাহার জানা ছিল, সেকালে দস্যুরা নরবলি দিত। যদি তাঁহাকেও সেইরূপে বলি দেওয়া হয় ভাবিয়া তিনি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহার গৃহিণী লজ্জাসম্ভ্রম ত্যাগ করিয়া পাগলিনীর বেশে দলপতির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, "আমার গুপ্ত ধনরত্ন অলঙ্কার যাহা আছে সব দিতেছি, আমার স্বামীকে ছাড়িয়া দিন।"

দলপতি বলিলেন, "আপনার কিছুই আমরা চাহি না। সাহা মহাশয়কে অমনি ছাড়িয়া দিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাকে কয়েকটি শপথ করিতে হইবে।

রাজীব সাহা। কি শপথ করিতে হইবে বলুন, করিতেছি,—আমায় ছাড়িয়া দিন।

দলপতি। এখানে নয়, গোপীনাথের পাদস্পর্শ করিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে।

তার পর সাহা মহাশয় গোপীনাথের মন্দিরে দস্যুদলপতির অনুজ্ঞাক্রমে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—

(১) অতিথি মাত্রকেই তিনি ভবিষ্যতে আশ্রয় দিবেন ;

(২) যে সব প্রজার জমি ছলে বলে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তাহা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিবেন ও কখন কোন প্রজার উপর অত্যাচার করিবেন না ;

(৩) বেণী রায়কে বার্ষিক সাত হাজার টাকা হিসাবে প্রণামী দিবেন।

ইহা ছাড়া, রাজীব সাহা বাধ্য হইয়া রাধাবল্লভকে কার্য্যচ্যুত করিলেন ও কিষণ সিংকে বখ্‌সিস দিয়া পূর্ব্বপদে বাহাল করিলেন।

প্রাণে প্রাণে রক্ষা পাইয়া সাহা মহাশয় গোপীনাথের চরণ নয়নজলে সিক্ত করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন আল্‌ফু মিঞা হঠাৎ বেণী রায়ের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি পত্র পাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল, "আমি জানিতে পারিয়াছি, আপনি ঘোরতর অত্যাচারী হইয়াছেন। প্রজাদের উপর দিন দিন আপনার দৌরাত্ম্য বাড়িয়া চলিয়াছে। উপস্থিত, আপনি রামগতি চক্রবর্ত্তী, রক্ষাকর ঘোষ ও কৃষ্ণধন দাসকে সদরে আটক করিয়া তাহাদের উপর ভয়ানক অত্যাচার করিতেছেন। শুনিতেছি, বাকি খাজানা না দিলে আপনি তাহাদের জাতি মারিবেন। উক্ত তিন জন হিন্দু প্রজার নিকট আপনার প্রাপ্য খাজানা মায় শুদ আমি পাঠাইহী দিব। এই পত্র পাইবামাত্র যেন তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আমি আরও জানিতে পারিয়াছি যে, আবদুল সেখের বিধবা স্ত্রীর সম্পত্তি আপনি ছলেবলে কাড়িয়া লইয়াছেন। ফৌজদারের চক্ষে ধূলা দিলেও আপনি ন্যায়ের নিকট অপরাধী। পত্র পাঠ উক্ত মহিলাকে তাঁহার সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবেন। নচেৎ আপনাকে যেরূপে হউক সায়েস্তা করিয়া জামালগ্রামে শান্তি স্থাপন করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

আল্‌ফু মিঞা পত্র পড়িয়া দাড়িতে হাত বুলাইয়া হাসিতে লাগিলেন। পার্শ্বে কাজিম নামক জনৈক পারিষদ বসিয়াছিল। প্রভুকে হাসিতে দেখিয়া দন্ত বাহির করিয়া সেও হাসিতে লাগিল। আল্‌ফু মিঞা বলিলেন, "হা হা, কাজিম, হা হা, বড় মজার চিঠি, পড়ে দেখ!"

কাজিম চিঠিখানা নাড়িয়া চাড়িয়া পড়িতে লাগিল ও পড়িতে পড়িতে হাসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আল্‌ফু মিঞা বলিলেন, "কি, তুমিও যে হাসি থামাইতে পারিতেছ না!"

কাজিম। ভাব্‌ছি, কোন ইয়ার বোধ হয় রগড় ক'রে এই চিঠিখানা লিখেছে।

আল্‌ফু মিঞা। না হে না, এ সেই পণ্ডিত ডাকাতেরই চিঠি। এইটুকু বুঝিতে পারিতেছ না?

কাজিম আবার মনোযোগ সহকারে চিঠিখানা দেখিয়া বলিল, "তাইত, ঠিক্ বলিয়াছেন, এ সেই বেটারই কাজ।" ইহা বলিয়া চাটুকার আবার একটু হাসিল।

আল্‌ফু মিঞা তাহা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বড়ই হাসিতেছ যে?"

কাজিম। বেত্‌মিজের সাহস দেখে। বেটা যেন তুর্কির সুলতান, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা!

আল্‌ফু মিঞা। এই পরিখা, এই সব সান্ত্রীরা যেন বৃথাই রয়েছে। একটা ডাকাতের ভয়ে আলফু মিঞাকে পত্র পাঠ হুকুম তামিল করিতেই হইবে, নয় কি?—হা হা!

কাজিম। এত বড় নবাববাড়ী, এত লোক জন, এত অস্ত্রশস্ত্র অমনি আছে কিনা! হা হা, এস না বাছাধনেরা একবার সৈয়দ মহম্মদ আল্‌ফু মিঞা সাহেবের খাঁইয়ের কাছে, বুঝিবে মজা! হা হা!

আল্‌ফু মিঞা বলিলেন, "কাজিম, দেখ এই পণ্ডিত ডাকাইতের

কড়া হুকুম এখনই কেমন তামিল করিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি রামগতি চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তিন জন হিন্দু প্রজাকে সম্মুখে ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকে জোর করিয়া গোমাংস খাওয়াইলেন ও সদর নায়েবকে আদেশ দিলেন যে সেই দিনই আবদুল সেখের বিধবার বাড়ী যেন জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। নায়েব তৎক্ষণাৎ হুকুম মোতাবেক কার্য্য করিল। আবদুল সেখের বিধবা তাঁহার শিশুকে লইয়া রাস্তায় দাঁড়াইলেন। আল্‌ফু মিঞা কহিলেন, "কাজিম, পণ্ডিত ডাকাতের হুকুমগুলি কেমন তামিল করিলাম?"

কাজিম। চমৎকার। কাফেরের চিঠির খাসা জবাব দিয়াছেন। বেটা একবার সাহস ক'রে এদিকে এলে হয়।

আল্‌ফু মিঞা। আর একটু কাজ বাকি আছে। আজ হিন্দুদের বারোয়ারী কালীপূজা। ঢোল পিটাইয়া দিতেছি, পূজা হইবে না, এবার পূজার পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

কাজিম। হা হা, বড় মজা হবে। আপনার এলেকায় একেই তো হিন্দু রায়তেরা সংখ্যায় অল্প, তায় একেবারে ভেড়ার মত শান্ত। টুঁ শব্দ করিতে পারিবে না। পণ্ডিত ডাকাত ব্রাহ্মণ। সে বলে বরেন্দ্রদেশে হিন্দুর ধর্ম্ম কর্ম্ম রক্ষা করিবে। করুক না এসে এখন রক্ষা।

ঢোল পিটানো হইল। জামালগ্রামের হিন্দুদিগের শত আবেদন ও কাতর প্রার্থনায়ও আল্‌ফু মিঞা কর্ণপাত করিলেন না।

সেই রাত্রেই পূর্ব্বোক্ত তিন জন হিন্দু লজ্জা ও অপমান ঢাকিবার জন্য উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া বেণী রায় ঝঞ্ঝার ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন ও দলবল সহ আল্‌ফু মিঞার বাড়ী আক্রমণ করিলেন। আক্রমণের বেগ সহিতে না পারিয়া আল্‌ফু মিঞার লোক জন পিছু হটিতে লাগিল ও শীঘ্রই শত্রুপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। আল্‌ফু মিঞা স্বয়ং লড়িতে লড়িতে নিহত হইলে তাঁহার মৃতদেহ তাঁহার নহবৎখানার সম্মুখে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। তার পর মিঞা সাহেবের বাড়ী লুঠ হইল। কিন্তু কেহ স্ত্রীলোক ও বালকের কোন দ্রব্য স্পর্শ করিল না।

আল্‌ফু মিঞাকে দমন করিয়া বেণী রায় রামগতি প্রভৃতির পোষ্যগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিলেন, আবদুল সেখের বিধবার নূতন বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিলেন ও তাঁহার হকের সম্পত্তি তাঁহাকে দেওয়াইলেন। আল্‌ফু মিঞার ওয়ারিশ বেণী রায়ের নির্দ্দেশমত জমিদারি চালাইতে লাগিলেন। জামালগ্রাম পরগণায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বেণী রায়ের কাণ্ডে জেকি খাঁ অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। "তাঁহাকে দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াও কোন প্রতিকার করিতে না পারিয়া তাঁহার ক্রোধ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বেণী রায় এক স্থানে স্থির থাকিতেন না। আজ এখানে, কাল সেখানে দুর্ব্বৃত্তকে শাসন ও আর্ত্তকে রক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। চতুর গোয়েন্দারাও তাঁহার সন্ধান জানাইতে না পারিয়া ব্যর্থকাম হইয়া সদরে খবর দিল যে এ দুষ্‌মনকে গ্রেপ্তার করা তাহাদের সাধ্যাতীত। ফৌজ-দার বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে বরখাস্ত করিলেন। এমন সময়ে সংবাদ আসিল, পণ্ডিত ডাকাইত চলন বিলের ভিতর সরকারের নৌকা লুঠ করিয়া মালগুজারির টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। জেকি খাঁ আরও কুপিত হইলেন।

তার পর পেস্কার ডাক লইয়া মফঃস্বল হইতে আগত চিঠির পর চিঠি পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। সকল পরগণা হইতেই কোতোয়াল ও দারোগারা প্রত্যেক কোতোয়ালিতে এক এক দল ফৌজ মোতায়েন করিতে প্রার্থনা জানাইয়াছে। তাহারা লিখিয়াছে, "এই পণ্ডীত ডাকাইত বেনি রায় অতিব দুর্ধর্শ বেক্তি। সে শরবত্র লুঠ তরাজ করিয়া বেড়াইতেছে ও জমিদারদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতেছে। বলিতেছে, পাঠান এ দেস সাসন করিতে অক্ষম বিধায় আমীই এ দেশ সাসনের ভার লইয়াছি। এই

দোশ্তু র আস্পর্দ্ধা এমন বাড়িয়াছে যে অবিলম্বে থানায় থানায় ফৌজ না পাঠাইলে সরকারের সাসন কার্য্য শুচারু রূপে নীর্বাহ হওয়া দুরুহ। এমত স্থলে হুজুর শত্তর যেরূপ হয় বিহীত করিবেন। ইতি।"

পত্রগুলির অভিপ্রায় জানিয়া ফৌজদার ক্রোধান্ধ হইয়া কোতোয়াল ও দারোগাদিগের কাহাকে বরখাস্ত করিলেন, কাহাকে বদলি করিলেন, কাহাকে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস উহাদের অক্ষমতাপ্রযুক্তই পণ্ডিত ডাকাইত ধরা পড়িতেছে না।

এদিকে দিন দিন বেণী রায়ের প্রতাপ বাড়িতে লাগিল। তিনি বরেন্দ্রভূমি হইতে পাঠান শাসন উচ্ছেদ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। সরকারি কাছারি ও ফৌজদারের কুঠি প্রভৃতি জ্বালাইয়া দিয়া তিনি পাঠান রাজকর্ম্মচারিগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন, রসদ ও খাজানা লুঠিতে লাগিলেন, অত্যাচারী রাজপুরুষদিগের যমস্বরূপ হইলেন। উৎপীড়নকারীরা দণ্ডের ভয়ে ভাল মানুষ সাজিল, শিষ্টের মুখোষ পরিয়া শাস্তির হাত এড়াইল। যাহারা পণ্ডিত ডাকাইতকে কখন দেখে নাই তাহারাও তাঁহার নামোচ্চারণে আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিল। সমগ্র বরেন্দ্রভূমে তাঁহার অসামান্য প্রতাপ, তাঁহার শক্তির কাছে সকল শক্তি স্তব্ধ। 'বেণী রায়ের দোহাই' অগ্রাহ্য করিবার সাহস সে অঞ্চলে কাহারও ছিল না।

এত দুর্দ্ধর্ষ হইলেও বেণীমাধব কখন সীমা লঙ্ঘন করিতেন না। সমুদ্র আপনার বেগে আপনি চঞ্চল, প্রবল, অপ্রতিহত, তবু সীমা

লঙ্ঘন করে না। বেণী রায় নির্লোভ নিস্পৃহ শুদ্ধাচারী ব্রহ্মচারীর বেশে থাকিতেন। তিনি যে অর্থ লুণ্ঠন করিতেন তাহার কপর্দ্দকও আপনার জন্য ব্যয় করিতেন না। উহা দরিদ্র ও বিপন্নের সম্পত্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কোথাও কোন নিরন্ন হিন্দু বা মুসলমানের অন্নবস্ত্রাদি জুটিতেছে না, অর্থাভাবে কাহারও চিকিৎসা চলিতেছে না, কন্যাদায়গ্রস্ত কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছে না, বেণী রায় অমনি তাহাদের অভাব দূর করিতেন। কোথাও কেহ ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছে, বেণী রায় স্পৃশ্য অস্পৃশ্য বিচার না করিয়া তাহাকে বিপন্মুক্ত করিতেন। পাষণ্ডপীড়নে পাষাণবৎ কঠোর হইলেও তিনি বস্তুতঃ অত্যন্ত কোমলহৃদয় ছিলেন। নিঃস্ব, বিপন্ন ও অসহায়ের দুঃখে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত, তাহাদের দুঃখ দূর না করিয়া তিনি জলবিন্দু স্পর্শ করিতেন না। কাহাকে কতটুকু দয়া করা কর্ত্তব্য সে বিচার না করিয়া দয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে মুক্ত প্রাণে দয়া করিতেন। দয়া হৃদয়ের বৃত্তি। লোকের দুঃখকষ্ট দারিদ্র্যদুর্দ্দৈবদর্শনে তাহার বিকাশ। তাই প্রকৃত দয়ালু ব্যক্তি দয়ার পরিমাণ স্থির করিয়া দয়া প্রকাশ করেন না।

শীঘ্রই দীন ও দুর্ব্বলের পরিত্রাতা বলিয়া বেণী রায়ের যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সাঁতোড়ের রাজা মুকুট রায়ের প্রতি তাঁহার রাজ্যের কেহ সন্তুষ্ট নয়। প্রজাদের আবেদনে নিবেদনে তিনি কর্ণপাত করেন না, কর্ম্মচারীরা সময় মত বেতন পান না। রাজা নিজে কিছুই দেখেন না, বিলাস আমোদে মত্ত থাকেন, দেওয়ান যাহা খুসী তাহাই করে। সাঁতোড়রাজ্যে বেণী রায়ের কুটুম্ব সান্ন্যাল মহাশয়েরা খুব প্রতাপশালী। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, মুকুট রায়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার পিসতুত ভাই, সাঁতোড়ের সৈন্যাধ্যক্ষ, গোপাল রায়কে সিংহাসনে বসাইবেন। কিন্তু সৈন্যেরা তাঁহার অনুগত হইলেও গোপাল চন্দ্র প্রকাশ্যভাবে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হন নাই। তাহা দেখিয়া সান্ন্যাল মহাশয়েরা বেণী রায়ের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বেণী রায় প্রথমে কিছু ইতস্ততঃ করিলেও সকল অবস্থা জানিয়া শেষে কুটুম্বদিগকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন।

পরামর্শক্রমে স্থির হইল, পুণ্যাহের রাত্রে রাজা মুকুট রায় যখন আমোদপ্রমোদে মগ্ন রহিবেন তখন গোপাল চন্দ্র সসৈন্যে রাজবাটী ঘেরাও করিবেন, সান্ন্যাল মহাশয়েরা প্রমোদভবন অবরোধ করিবেন, বেণী রায় স্বয়ং ছিপ্ দিয়া সাঁতোড় বেষ্টন করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিবেন ও উপস্থিত মত যেরূপ হয় ব্যবস্থা

করিবেন। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে কার্য্য আরম্ভ হইল। নৃত্যগীতের উল্লাসে মত্ত রাজা সহসা চারিদিকে গোলযোগ শুনিয়া তাহার কারণ বুঝিতে পারিলেন না। এমন সময়ে একটি বিশ্বস্ত পদাতিক দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া সংবাদ দিল, "সেনাপতি রাজবাড়ী আক্রমণ করিয়াছেন, সান্যাল মহাশয়েরা এই বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছেন, পণ্ডিত ডাকাইত সহরের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছেন, সৈন্যদের কেহই আপনার হইয়া লড়িতেছে না।"

মুকুট রায় এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া কেবল কহিলেন, "বিশ্বাসঘাতক!"

দেখিতে না দেখিতে বেণী রায় সেই প্রমোদভবনে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "সাঁতোড়-রাজ, আপনি বন্দী!"

রাজা মুকুট রায় আগন্তুকের ব্রহ্মচারীর বেশ দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কে তুমি, সন্ন্যাসি?"

বেণী রায়। পরিচয় অনাবশ্যক। আপনার লোকেরা আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছে। যদি আত্মরক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে আসুন।

রাজা। আমার অন্তঃপুরমহিলারা ও পরিবারভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরা?

বেণী রায়। তাঁহাদিগকে বজরায় আনা হইয়াছে। আপনাকে সেই বজরায় যাইতে হইবে।

রাজা। আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবেন?

বেণী রায় আর কোন কথা না বলিয়া মুকুট রায়কে তাঁহার অনুগমন করিতে বলিলেন।

অবশেষে তাঁহারা বজরায় পঁহুছিলে বেণী রায় কহিলেন, "আপনি এখন হইতে সপরিবারে কাশীবাস করিবেন। যদি রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করেন তবে প্রাণ হারাইবেন। সাঁতোড়ের লোকেরা গোপাল চন্দ্রকে তাহাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। একরূপ বিনা রক্তপাতে যে এই রাজপরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহা খুব মঙ্গলের কথা বলিতে হইবে।"

মুকুট রায় আক্ষেপের সহিত কহিলেন, "আমার রাজ্যচ্যুতি মঙ্গলের কথা ?"

বেণী রায়। যাহা প্রজাদের অভিপ্রেত, তাহাদের কল্যাণকর, তাহা মঙ্গলের কথা বই কি ? রাজা মুকুট রায়, আপনি বৃদ্ধবয়সে যে বিশ্বনাথের আশ্রয় লাভ করিতে পারিলেন, ইহা আপনার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কথা।

মুকুট রায়। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) দুই দণ্ড পূর্ব্বে যে সাঁতোড়ের চৌদ্দ পরগণার অধীশ্বর ছিল, আজ সে পথের ভিখারী ! হায়, ঐশ্বর্য্য, হায় রাজ্যসুখ !

বেণী রায়। আপনাকে পথের ভিখারী হইতে হইবে না। এই বজরায় আমি লক্ষ টাকা আপনার কাশীবাসের খরচের জন্য রাখিয়াছি। উহা দ্বারা আপনি মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে পারিবেন।

মুকুট রায় বক্তার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কে ?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বেণীমাধব কহিলেন, "আমি বেণী রায়।"

সহসা বজ্রপাত হইলে লোকে যেমন চমকিয়া উঠে বেণী রায়ের নামে মুকুট রায় তেমনি চমকিয়া উঠিলেন। তিনি কি বলিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু রোষে ও বিস্ময়ে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে যখন তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল তখন বেণী রায় সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন। মুকুট রায় তাঁহাকে আশে পাশে কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

শুনা যায়, পূর্ব্বস্থলীতে মুকুট রায়ের ক্ষুদ্র মাতুলসম্পত্তি ছিল। তিনি কাশীবাস না করিয়া সেইখানেই দিনপাত করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এদিকে রাজমহলের যুদ্ধে টোডরমল্ল বাদশাহ দাউদ শাহকে বধ করিয়া তাঁহার মুণ্ড দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। জমসেদ খাঁ প্রভুকে রক্ষা করিতে গিয়া নিহত হইলেন। বিজয়দৃপ্ত মোগল সৈন্যগণ স্রোতোবারির ন্যায় বঙ্গদেশ ছাইয়া ফেলিল। মানসিংহ তাঁহার ভ্রাতা ভানু সিংহের সহিত সসৈন্যে পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গে রওনা হইলেন। কিয়দ্দূর একত্র গিয়া মানসিংহ ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, ভানু সিংহ বরেন্দ্রভূমে যাত্রা করিলেন।

ফৌজদার জেকি খাঁ বারেন্দ্র জমিদারগণের নিকট মোগলের বিরুদ্ধে সাহায্য চাহিয়াও নিরাশ হইলেন। কেবল ভাদুড়িয়ার রাজা জগৎ নারায়ণ খাঁ পাঠানের পক্ষে রহিলেন। ছাতকের রাজা কালিদাস রায়, সাঁতোড়ের রাজা গোপাল চন্দ্র রায়, তাহির-পুরের রাজা কংসনারায়ণ রায় প্রভৃতি বরেন্দ্রভূমির নরপতিগণ প্রকাশ্যরূপে মোগলের সহায়তা করিতে লাগিলেন।

ভাদুড়িয়ার সৈন্য ও পাঠানসৈন্য ভানু সিংহকে যুগপৎ আক্রমণ করিয়া শীঘ্রই পরাজিত হইল। জেকি খাঁ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। ভানু সিংহ তখন সপ্তদুর্গা (সাতগড়া) অধিকার করিবার জন্য ভাদুড়িয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

পাঠান রাজত্ব লোপ পাইতে বসিয়াছে, মোগল আসিতেছে; এই সুযোগে বেণী রায় বারেন্দ্র রাজাদিগকে হিন্দুরাজ্য স্থাপন

করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কেহই অমিত-পরাক্রমশালী আকবর বাদশাহের গতিরোধ করা সম্ভবপর নয় বিবেচনা করিয়া তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। কেহ তাঁহাকে পাগল বলিয়া তাঁহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কেহ তাঁহাকে মতলবি লোক মনে করিলেন। কিন্তু কেহই সাহায্য করিলেন না।

বেণী রায় ভাবিলেন, যেমন অধ্যাসবশতঃ রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজতভ্রম হয়, প্রান্তরে মরীচিকাদর্শনে জলভ্রম হয়, তেমনি ইহাদেরও আতঙ্কবশতঃ মোগলকে দুর্দ্ধর্ষ বোধ হয়। পিত্তরোগীর কাছে সকল বস্তুই পীতবর্ণ দেখায়। ইহাদের মানুষের আকার হইলেও ইহারা মানুষ নয়। ময়না "রাধাকৃষ্ণ" বলে বলিয়া মানুষ নয়, অনিত্য নিত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় বলিয়া নিত্য নয়, সোলার পাখী পাখী নয়, মৃণ্ময় ব্যাঘ্র ব্যাঘ্র নয়। আমার কাছে ইহারা আর্য্যজাতির পূর্ব্বগৌরব ও বীরত্বের কথা শুনিয়া মনে মনে হাসে। কূপমণ্ডূক সমুদ্রের কুম্ভীরের মুখে সমুদ্রের প্রবলতার কথা শুনিয়া কুম্ভীরকে প্রতারক বলিয়া উপহাস করিয়াছিল।—হাসুক, উহারা আজ হাসিতেছে, কিন্তু কাল কাঁদিবে। আমার বিশ্বাস ছিল, যেমন সোণায় খাদ মিশাইলে সোণা রূপা বা তামা হয় না, সোণাই থাকে, তেমনি বৈষম্যের খাদ মিশিলেও জাতির জাতীয়তা যায় না, জাতি জাতিই থাকে। এখানে দেখিতেছি, এই সনাতন নিয়মের ব্যভিচার হইয়াছে। এখানে আছে শুধু ভেদবৈষম্য, নাই আত্মপ্রত্যয়, যাহা বাষ্পের মত

আপনার বলে আপনি চলে ও অপরকে চালাইতে সক্ষম হয়। তাই সকলের বিশ্বাস বালুকাসৈকতের ন্যায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, দৃঢ় বেলাভূমির ন্যায় অটল নয়। এই পোড়া দেশেই বীজ বীজই রহিল, বৃক্ষ হইল না। যাহারা বুঝে না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তারাপুঞ্জে ছায়াপথ, বিন্দু বিন্দু বারিসংযোগে মহাসাগর, রেণু রেণু বালুকা সমূহে মরুভূমি, ভিন্ন ভিন্ন তরুলতাগুল্মে দণ্ডকারণ্য, খণ্ড খণ্ড প্রস্তরস্তূপে হিমাচল, অণুপরমাণুর সমষ্টিতে এই জগৎ, তাহাদের আবার ভরসা! ইহাদিগের দ্বারা কিছু হইবে না। দেখি ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া আমি মোগলের বিরুদ্ধে কি করিতে পারি। নরবানরে রাবণকে সবংশে নির্ব্বংশ করিয়াছিল, দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমি কি কিছুই পারিব না?

বেণী রায় সকল বারেন্দ্র রাজাকে স্পষ্টাক্ষরে কাপুরুষ বলিয়া নিজেই ভানু সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সম্মুখ সমরে না হউক, অতর্কিত আক্রমণে রাজপুতবীরকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতে সংকল্প করিলেন। হইলও তাহাই। এখন হইতে বেণী রায় জলে স্থলে ভানু সিংহের সৈন্যদিগের উপর সহসা লাফাইয়া পড়িয়া তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইতে লাগিলেন, রসদ লুঠিয়া লইয়া ও শিবির জ্বালাইয়া দিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এইরূপে উপদ্রুত হইয়া ভানু সিংহ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। পণ্ডিত ডাকাইত প্রকাশ্যে যুদ্ধ করেন না, মোগল সৈন্যেরা যখন সারাদিনের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নিদ্রা যায়, তখন তিনি তাহাদিগের উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন। এ তো বড় দায়।

রাজপুতবীর প্রকাশ্য যুদ্ধক্ষেত্রেই বরাবর লড়িয়া আসিয়াছেন, বেণী রায়ের সংগ্রামপ্রণালীতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। মোগল সৈন্যের তুলনায় পণ্ডিতের দল সংখ্যায় অল্প। কাজেই বেণী রায়ের পক্ষে এইরূপ অতর্কিত আক্রমণ ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এদিকে ভানু সিংহ ভাদুড়িয়ার রাজধানী সপ্তদুর্গা অধিকার করিলে রাজা জগৎনারায়ণ খাঁ আকবর বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। কিন্তু মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি তাঁহাকে করদরাজের ক্ষমতা দিলেন না। রাজা জগৎনারায়ণ তাঁহার অনেক পরগণা হারাইলেন ও এখন হইতে সামান্য জমিদারশ্রেণীভুক্ত হইলেন।

ইতিমধ্যে রাজা গোপাল চন্দ্র রায় ভানু সিংহকে বহু বার বহু উপঢৌকন পাঠাইয়া তাঁহার রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাই মোগল বাদশাহের প্রতিনিধি সাঁতোড়ে যাইতেছেন। তাঁহার ইচ্ছা, রাজা গোপাল চন্দ্রের সহায়তায় বেণী রায়কে দমন করিবার ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু তিনি যখন চলন বিলের মধ্য দিয়া যাইতেছিলেন তখন রজনীর অন্ধকারে তাঁহার নৌবাহিনী কতকগুলি ছিপ্ দ্বারা সহসা আক্রান্ত হইল। সেই আক্রমণের ফলে মোগলদিগের রসদবোঝাই নৌকা আর কয়েক খানি নৌকার সহিত জলমগ্ন হইল। ভানু সিংহের রণতরী শত্রুর ছিপ্গুলির পশ্চাদ্ধাবন করিতে না করিতে উহা বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল। চলন বিলে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও আক্রমণকারীদিগের একখানি ছিপ্ও দেখিতে পাওয়া গেল না। এতগুলি ছিপ্ মুহূর্ত্তের মধ্যে কিরূপে ও কোথায় অন্তর্হিত হইল ভানু সিংহ তাহা বুঝিতে

পারিলেন না। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, সপ্তডর্গার সৈন্যেরাই বুঝি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাদিগকে পুনরাক্রমণ করিয়াছে। কিন্তু রজনী প্রভাত হইলে তাঁহার সে ভ্রম ঘুচিল। ইহা যে বেণী রায়েরই কাণ্ড তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকি রহিল না। এখন কিরূপে এই গুপ্তশত্রুকে বিনাশ করিতে পারিবেন, ভানু সিংহের ইহাই প্রধান চিন্তার বিষয় হইল।

অবিলম্বে চারিদিকে ঘোষিত হইল, যে বেণী রায়কে ধরাইয়া দিতে পারিবে, তাহাকে দশ হাজার আসরফি পুরস্কার দেওয়া হইবে। কিন্তু কোথাও তাঁহার খোঁজ খবর পাওয়া গেল না।

সাঁতোড়ে পঁহুছিয়া তিনি রাজা গোপাল চন্দ্রকে বলিলেন, "সাঁতোড়-রাজ, মোগল বাদশাহের সহিত আপনার মৈত্রী আমাদের চিরদিন স্মরণ রহিবে। একমাত্র বেণী রায় ব্যতীত এখন আর আমাদের অন্য শত্রু নাই। এই দস্যুদলপতিকে ধরাইয়া দিয়া এদেশে মোগলশাসন নিষ্কণ্টক করুন। আপনাকে 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত করিবার জন্য আমি বাদশাহের নিকট প্রস্তাব করিব।"

রাজা গোপাল চন্দ্র কহিলেন, "সেনাপতি, বেণী রায় যে সে লোক নহেন। তাঁহার যেমন অসামান্য প্রতাপ তেমনি অপরিমেয় জ্ঞান, বুদ্ধি ও লোকহিতৈষণা। যখন পাঠান প্রজাদের ধন মান প্রাণ বাঁচাইতে অক্ষম হয় তখন একা বেণী রায় এদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। আমার বিশ্বাস তাঁহাকে সদ্ভাবে ভিন্ন অন্য উপায়ে বশ করা সম্ভবপর হইবে না।"

ভানু সিংহ। দস্যুর সহিত সদ্ভাব? যে রসদ লুটিয়া লয়, ডাকাতি করিয়া দিনপাত করে, যাহার ভিটাকে পাঠানেরা 'সয়তানের ভিটা' বলে, যাহার জন্য এদেশে শান্তি স্থাপন করা যাইতেছে না তাহার সহিত সদ্ভাব অসম্ভব।

রাজা গোপাল। বেণী রায় পণ্ডিত, দেশের শান্তিকামী; ত্যাগী সন্ন্যাসীর মত তাঁহার জীবন। আমার মনে হয়, যদি তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, পাঠানের রাজ্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশ হইতে অরাজকতা উঠিয়া গিয়াছে, সমস্ত বরেন্দ্রভূমি মোগল বাদশাহের সুশাসনে থাকিতে চায়, জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি একা এই বিরাট্ শক্তির বিপক্ষে দাঁড়াইয়া কিছু করিতে পারিবেন না, বিশেষ, যে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছেন সেই শান্তি তিনি অস্ত্র ত্যাগ না করিলে বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে তিনি আর মোগলের শত্রুতা করিবেন না। পাঠান প্রজারঞ্জন করিতে পারে নাই, আপনারা যদি তাহা পারেন, তবে বেণী রায় কখনই আপনাদের প্রতিকূলতা করিবেন না।

ভানু সিংহ। মানিলাম, বেণী রায় আপনার বর্ণিত গুণবিশিষ্ট। কিন্তু তাঁহাকে বুঝাইবার ভার কে লইবে?

রাজা গোপাল। আপনি। মোগল বাদশাহের প্রতিনিধির মুখে আশা ভরসার কথা শুনিলে তাঁহার প্রত্যয় হইবে, তিনি আপনাদের শত্রুতাচরণ করিবেন না।

ভানু সিংহ। আচ্ছা, আর আর বারেন্দ্র রাজাদিগের

অভিমত জানিবার জন্য একটা পরামর্শসভা আহ্বান করিলে কেমন হয় ?

রাজা গোপাল। সে খুব ভাল কথা। আপনি সাঁতোড়ে এক দরবার করিয়া দেশের মান্যগণ্য প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলে ভাল হয়। সকলের মতে যাহা স্থির হয় তাহাই ঠিক।

যথাসময়ে দরবার বসিল। সম্রাটের প্রতিনিধি প্রথমে মোগল বাদশাহের সদিচ্ছা ও সহৃদয়তা ঘোষণা করিলেন। তৎপর বেণী রায়কে কিরূপে বশ করা যায় সে বিষয়ে জমিদারদিগের অভিমত জানিতে চাহিলেন। সকল হিন্দু জমিদারই একবাক্যে কহিলেন, "বেণী রায়কে মৈত্রী ও সদ্ভাবে বশ করা ভিন্ন অন্য উপায়ে বশ করা অসম্ভব। যাহাতে মোগল সেনাপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারেন সাঁতোড়ের রাজা সে উপায় করিয়া দিবেন।"

নবম পরিচ্ছেদ।

বেণী রায়, যুগল ও চণ্ডী একসঙ্গে বসিয়া আছেন। সকলেই নীরব। তাঁহাদের মুখে চোখে চিন্তার পাণ্ডুর রেখা দেখা যাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে বেণী রায় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিলেন, "দেখিলে, বরেন্দ্রভূমির একটি লোকও মোগলের বিরুদ্ধে আমাদের সহায়তা করিতেছে না। ভাতুড়িয়া পাঠানের জন্য লড়িয়াছিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মোগলের সহিত সন্ধি করিয়াছে। সাঁতোড়, তাহিরপুর, ছাতক প্রভৃতির পরাক্রান্ত ভূস্বামীরা সকলেই মোগলের পক্ষে। হিন্দুরাজ্যস্থাপনে কাহারও আগ্রহ নাই। সকলই কালের প্রভাব। ত্রিসংসার কালের অধীন। কালে মোগল ভারতের অধিপতি! এই মোগলকে বিতাড়িত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। দাউদ শাহ্ এত পদাতিক ও অশ্বরোহী সৈন্য থাকিতে, এত রণতরী ও যুদ্ধ হস্তী থাকিতে, এত কামান থাকিতে যাহা পারেন নাই, মুষ্টিমেয় লোকবল লইয়া আমরা কিরূপে তাহা পারিব? যতদিন মোগল এদেশে শান্তিস্থাপন করিতে না পারে ততদিন আমরা লোক রক্ষা করিব। তারপর আমাদের দল রাখিবার দরকার হইবে না। পাঠান মূর্খ, প্রজার অসন্তোষে রাজ্য হারাইল, মোগল চতুর, প্রজার সন্তোষই তাহার রাজ্যশাসনের মূলসূত্র। শুনিয়াছি, আকবর প্রজারঞ্জক বাদশাহ। তিনি প্রজাদিগকে তুষ্ট রাখিয়া দেশ শাসন করিতে পারিলে আমাদের

অস্ত্রধারণের আর কোনই প্রয়োজন রহিবে না। এ দল ভাঙ্গিয়া দিয়া আমি হিমাচলে চলিয়া যাইব, জীবনের শেষ কয়টা দিন যোগসাধনায় কাটাইব।"

যুগল। মোগলেরা যতই ভাল হোক্ না কেন, হিন্দু জন সাধারণের স্বার্থ অধিকার রক্ষা করিবার জন্য আমাদের বর্ত্তমান দল রাখা উচিত মনে করি। আপনি চলিয়া গেলে অরাজকতা আবার তাহার ফনা বিস্তার করিবে। তখন কে দুর্বৃত্তকে দলন করিবে, দুর্ব্বলকে আশ্রয় দিবে ?

বেণী রায়। একটা ভাব জলাশয়ে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রখণ্ডের মত। প্রথমে একটা ক্ষুদ্র বৃত্ত, পরে একটা বৃহৎ বৃত্ত, তার পর আর একটা বৃহত্তর বৃত্ত, এইরূপে একই বৃত্ত হইতে বৃত্তের পর বৃত্ত, অনন্ত বৃত্ত উৎপন্ন হয়। দেশের চিত্তবাপীতে ভাবের বিস্তারও সেইরূপ। উহা ধীরে ধীরে এক হইতে বহুতে ব্যাপ্ত হয়। মানুষ যায়, ভাব থাকে। আমি গেলেও আমার ভাব থাকিবে। লোকাভাব হইবে না।

যুগল। কিন্তু সে লোক আপনার মত হইবে না। এ জগতে যেটি যায় ঠিক সেটি আসে না। আমরা সামান্য সদিচ্ছা লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। আপনি তাহাকে বিরাট্ আকার দিয়াছেন। আমরা দুই একটি সামান্য লোককে সায়েস্তা করিতে পারি নাই, আপনি শত দুর্দ্দান্ত দুর্বৃত্তকে দমন করিয়াছেন। আপনার ভয়ে পাঠান রাজশক্তি থর থর কাঁপিত, অতি প্রতাপী মোগলশক্তিও সর্ব্বদা সশঙ্ক, আপনার তুল্য কে আছে ? আপনি

যাহা পারিয়াছেন, অন্যে তাহা পারিবে না। যদি আপনিই না থাকেন, এই দলও না থাকে, তবে আমরাই বা থাকি কেন?

বেণী রায়। তোমরা গৃহবাসী ছিলে গৃহবাসী হইবে। আমি গৃহহীন, যেদিকে মন লয় চলিয়া যাইব। আমার কার্য্যেরই যখন কোন প্রয়োজন রহিল না, তখন আমার দলেরই বা প্রয়োজন কি, দলপতিত্বেই বা দরকার কি?

চণ্ডী। আমি নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখি না। সংখ্যা মনের অবস্থার উপর নির্ভর করে। পঞ্চাশজন বাছা বাছা লোক দুর্দ্ধর্ষ হইয়া দাঁড়াইলে লোকে মনে করে উহারা পাঁচ শত। আমাদের দলের লোকের নামে অত্যাচারী কাঁপে, আমরা সর্ব্বদা সজাগ, মৃত্যুভয়ে ভীত নই। কাজেই শতগুণ অধিক শত্রুকেও আমরা দমন করিতে পারি। মোগলেরা জানে না আমরা সংখ্যায় কত। আমাদের প্রতাপে তাহাদের আতঙ্ক জন্মিয়াছে। আতঙ্ক জন্মিলে রজ্জুকে সর্পভ্রম হয়, একে বহু ভ্রম হয়। তবে আমরা কেন তাহাদিগের সহিত পারিয়া উঠিব না? সংখ্যাই কি সব? আমরা দেহের শেষ রক্তবিন্দু পাত করিয়াও মোগলকে বরেন্দ্রভূমি হইতে বিতাড়িত করিব।

বেণী রায়। আকাশকুসুম, দিবাস্বপ্ন! সমস্ত দেশ চায় মোগলকে। সেই মোগলকে উচ্ছেদ করার সাধ্য কার? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই শক্তিশালী রাজশক্তি, যাহা রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম, অত্যাচার উৎপীড়ন দমন করিতে সমর্থ, তাহা অচিরে এদেশে সুশাসন প্রবর্ত্তিত করিবে। তবে যতদিন সেই সুদিন প্রভাত না হয় ততদিন আমরা আমাদের কাজ করিয়া যাইব।

তৃতীয় খণ্ড

বিদ্যুতের তিমিরসমাধি

জন্য পুরস্কারস্বরূপ বেণী রায়কে পূর্ব্বেই দেড় লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। এখন বিমলার বিবাহের যাবতীয় ব্যয় দিলেন। পণ্ডিত বিদায়ের প্রস্তাব উঠিলে বেণী রায় বলিলেন, "এই সব মূর্খ অকাল কুষ্মাণ্ড নীচাশয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নয়। ইহাদিগকে দান করিলে পুণ্য তো নাই-ই, বরং এইরূপে আলস্য ও মূর্খতার প্রশ্রয় দিলে পাপ আছে। আমি নবদ্বীপ ও বিক্রমপুরের যে সব প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিয়াছি তাঁহাদিগের প্রত্যেককে পদমর্য্যাদা অনুসারে এক হইতে পাঁচ আসরফি পর্য্যন্ত বিদায় দিয়াছি। কিন্তু বরেন্দ্রভূমির গর্দ্দভগুলিকে রিক্তহস্তে বিদায় দিব, স্থির করিয়াছি।"

ক্রুদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলী বেণী রায়ের উপর প্রতিহিংসা লইবার জন্য তাহার জামাতাকে ও তৎসম্পর্কিত প্রধান সাহায্যকারীদিগকে "বেণী পাঠার কুলীন" নাম দিয়া সমাজে কোণঠাসা করিয়া রাখিলেন। কিন্তু রাজা গোপাল চন্দ্রের বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে হৃষীকেশ ঠাকুরের কন্যাদায় উপস্থিত। ইহা ছাড়া তাঁহার আর একটি ভগ্নীও বিবাহযোগ্যা। অথচ অর্থাভাবে তিনি কাহারও বিবাহ দিতে পারিতেছেন না। দুইটি পাত্র স্থির আছে, কিন্তু আবশ্যকীয় ধন সংগ্রহ হইতেছে না। তিনি যে জমিদারের বাড়ীতে যান সেখান হইতেই ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসেন। বেণী রায়কে যে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা জব্দ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন. তাঁহাদের নেতাদিগকে কোন বারেন্দ্র জমিদার সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। হৃষীকেশ সর্ব্বত্র নিরাশ হইয়া ভাদুড়িয়ার রাজার নিকট গেলেন। সেখান হইতেও কোনরূপ অর্থসাহায্য না পাইয়া তিনি বিষণ্ণমনে সাতগড়ার 'রাজার ঘাটে' উপস্থিত হইলেন।

ঘাটে একখানি ছিপ্ বাধা ছিল। আরোহীরা তখনই ছিপ্ ছাড়িয়া দিবে দেখিয়া হৃষীকেশ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে, তোমরা কোথায় যাইবে?"

নৌকা হইতে এক ব্যক্তি হৃষীকেশকে চিনিতে পারিয়া কহিলেন, "কামালপুরে। কেন, ঠাকুর মশায়ও কি সেইখানেই যাইবেন?"

হৃষীকেশ। হাঁ, আমাকে তোমাদের ছিপে লইয়া চল, আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্য আরোহী রঙ্গ করিয়া বলিলেন, "শুধু আশীর্ব্বাদ, ভাড়াটা?"

হৃষীকেশ। দেখিতেছি, তোমাদের দেবদ্বিজে একেবারেই ভক্তি নাই।

নৌকারোহীদিগের মধ্যে যিনি হৃষীকেশের সহিত প্রথম কথা বলিয়াছিলেন তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, ভট্টাচার্য্য ঠাকুর অমনি চলুন।"

হৃষীকেশ তাঁহার পুঁটুলি লইয়া ছিপে উঠিলেন ও নৌকারোহী দিগের নিকট তাঁহার বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কথা বলিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জমিদারদিগকে ও বেণী রায়কে যথেষ্ট গালি দিয়া তাঁহাদিগকে শীঘ্র উচ্ছন্ন যাইবার জন্য অভিসম্পাৎ দিলেন। ইহা শুনিয়া নৌকারোহী ব্যক্তিরা হাসিয়া উঠিলেন। হৃষীকেশ ঠাকুর ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বলিলেন, "ঘোর কলি, ঘোর কলি, নহিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দুঃখে তোমরা হাস্য করিবে কেন?" বিক্তা (?) হস্তে ফিরিবার পর শেষে এই অপমান?"

এমন সময়ে আরোহীদের মধ্যে একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঠাকুর মশায়ের নাম কি?"

হৃষীকেশ। আমাকে চেন না, তুমি কোন্ দেশের লোক হে? আমার নাম শ্রীহৃষীকেশ দেবশর্ম্মা তর্কালঙ্কার।

ইহা শুনিয়া প্রথমোক্ত ব্যক্তি হাস্য সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "সেকি, ভট্টাচার্য্য মশায় কবে থেকে তর্কালঙ্কার হইলেন?"

হৃষীকেশ। তুমি তো বড় বেল্লিক দেখিতেছি। পণ্ডিতের সম্মান রক্ষা করিয়া কথা বলিতে জান না। হবে না কেন, যেমন কাল, তেমনি লোকাচার। তোমরা সাতগড়ার লোক না? যেমন রাজা, তেমনি প্রজা।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। ঠাকুর, আমাদের নৌকায় চড়িয়া আপনি আমাদেরই নিন্দা করিতেছেন। এখান হইতে আপনাকে সাঁতরাইয়া বিল পার হইতে হইবে।

হৃষীকেশ। (কাঁপিতে কাঁপিতে) সর্ব্বনাশ! এই সমুদ্রে, এই চলন বিলের মধ্যে নামাইয়া দিবে? ব্রহ্মহত্যা করিবে? তোমাদের পায়ে পড়ি বাবা, এই গরীব ব্রাহ্মণকে পার করে দাও! তোমাদের রাজার মঙ্গল হবে, তোমাদের পুণ্য হবে।

পায়ে পড়ার কথায় কেহ 'নমস্কার', কেহ 'প্রণাম' বলিয়া উঠিলেন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, "চলুন, বাকি সামান্য পথটুকু আমাদের ছিপেই চলুন।"

ছিপ্ কামালপুরে ভিড়িলে হৃষীকেশ পুঁটুলি লইয়া নামিতেই দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিলেন, "ঠাকুর, ওটা রেখে যেতে হবে। আমরা পণ্ডিত ডাকাতের লোক। আমাদের কাছে আপনি তাঁর যে নিন্দাচর্চ্চা করিয়াছেন তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পুঁটুলি দিতে হবে।"

হৃষীকেশ মুখব্যাদান করিয়া "অ্যা" বলিয়া আর কিছু কহিতে পারিলেন না। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। পুঁটুলিটা রাখিয়া গেলে চলে না, উহাতে নানাস্থান হইতে সংগৃহীত

যে সামান্য অর্থ আছে তাহা ছাড়া যায় না, অথচ "অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ" বচন অমান্য করিলেও চলে না, এইরূপ দোমনা হইয়া হৃষীকেশ হতভম্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এমন সময়ে প্রথমোক্ত ব্যক্তি বলিলেন, "চণ্ডী, এই ব্রাহ্মণের পুঁটুলি খোল।"

হৃষীকেশ। (করজোড়ে) দোহাই পণ্ডিত ডাকাতের, আমার যথাসর্ব্বস্ব লইও না।

চণ্ডী পুঁটুলি খুলিয়া বক্তার আদেশক্রমে উহাতে সহস্র মুদ্রা বাঁধিয়া দিলেন। হৃষীকেশ তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থানোদ্যত হইতেই চণ্ডী হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "সেকি ঠাকুর, ডাকাতের দান লইলেন? আর, এত তাড়াতাড়ি কেন? আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ না করিয়াই যাইতেছেন?"

হৃষীকেশ। হাঁ, হাঁ, দীর্ঘায়ুঃ হও, তোমাদের পণ্ডিত ডাকাতের কল্যাণ হোক্।

চণ্ডী। ঠাকুর তাঁকে চেনেন কি?

হৃষীকেশ। না, নাম শোনা আছে।

প্রথম বক্তা। একবার পরিচয় হইলে মন্দ কি?

চণ্ডী। ভবিষ্যতে আরো কিছু সাহায্যের সুবিধা হইতে পারে। তবে পরিচয়টা—

হৃষীকেশ। নিষ্প্রয়োজন। উপস্থিত আমাকে কামালপুর হইতে কাছিকাটায় যাইতেই হইবে।

চণ্ডী। পরিচয়ের প্রয়োজন কেবল তাঁর অর্থের সঙ্গেই বুঝি?

না, না, তা হবে না। বিনা পরিচয়ে আপনাকে যাইতে দিব না। আপনি আমাদের ঠাকুরের এমন কল্যাণকামী! আসুন, বলুন দেখি, আমাদের মধ্যে কে পণ্ডিত ডাকাত?

হৃষীকেশ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কাহাকেও পণ্ডিত ডাকাত বলিয়া চিনিতে না পারায় প্রথম বক্তা হাসিয়া বলিলেন, "হৃষীকেশ ঠাকুর, আমিই বেণী রায়।"

বিস্ময়ে, লজ্জায় হৃষীকেশের মুখমণ্ডল আরক্ত হইল। তিনি যাই বলিতেছিলেন, "আ—আ—আপনিই বেণী মামা?" অমনি ছিপ্ আরোহীদিগের সহিত তীরবেগে অন্তর্হিত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা গোপাল চন্দ্রের মধ্যবর্ত্তিতায় সাঁতোড়ের প্রাসাদে বেণী রায়ের সহিত ভানু সিংহের সাক্ষাৎকার হইয়াছে। তাঁহারা পরস্পর কথোপকথনে রত। ভানু সিংহ বলিতেছিলেন, "ঠাকুরজি, পাঠানের আমলে এদেশে শান্তি ছিল না। তাই মোগল এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছে। ইহার মধ্যেই বাদশাহের সদভিপ্রায় সর্ব্বত্র ঘোষণা করা হইয়াছে। জনসাধারণের স্বার্থ অধিকার রক্ষাকল্পে বারেন্দ্র জমিদারদিগকে লইয়া এক সমিতি গঠিত হইয়াছে। মোগল জানে প্রজার সন্তোষই সকল রাজ্যের ভিত্তি। নিশ্চিত জানিবেন, আকবর বাদশাহ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রজার মনোরঞ্জন করিয়া যে যশঃ অর্জ্জন করিয়াছেন বাঙ্গালায়ও তাহা করিবেন। তিনি সকল প্রকার অত্যাচার উৎপীড়নের বিরোধী। তাঁহার অধীনে প্রায় সকল উচ্চ পদই ভারতবাসীদের অধিকৃত। শাসন সংরক্ষণ সকল বিষয়ে তাহাদের মত লইয়া কাজ হইতেছে। ভাবিয়া দেখুন, মোগল নামে সম্রাট, বস্তুতঃ আমরাই সব। এমন সুখসৌভাগ্য আমাদের বহুকাল হয় নাই।

বেণী রায়। সেনাপতি, স্বর্ণশৃঙ্খলও শৃঙ্খল। পরের ছেলে হাজার ভাল হোক, তার চেয়ে নিজের কাণা ছেলেও ভাল।

ভানু সিংহ। সত্য কথা, কিন্তু হিন্দুদের কজনা স্বরাজ্য কামনা করে, কজনা নিজেদের রাজ্যপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর

হইয়াছে? ভারত হিন্দুরাজত্ব ফিরিয়া চায় না, চায় শান্তি। এমত স্থলে পরাধীনতা অনিবার্য্য। পরাধীনতাই যদি করিতে হয় তবে প্রবল মোগল শাসনাধীনে থাকাই ভারতের পক্ষে শ্রেয়স্কর। বল-বুদ্ধিতে শাসনে পালনে এসময়ে মোগলের সমকক্ষ জগতে কেহ নাই। আমি জানি, আপনি বরেন্দ্রভূমিতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি? এই যে পরাক্রান্ত বারেন্দ্র নরপতিরা রহিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে এক জনও কি আপনার সহায়তা করিয়াছেন?

বেণী রায়। (দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আমি সব বুঝিতে পারিয়াছি। আপনাকে কি উত্তর দিব তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছি। বুঝিয়াছি আমি অস্ত্রত্যাগ না করিলে বরেন্দ্রভূমে শীঘ্র শান্তিপ্রতিষ্ঠা হইবে না। তাই আজ হইতে এই তরবারি ত্যাগ করিলাম। মোগল নির্ব্বিরোধে এদেশে রাজত্ব করুক। আপনি এই দাসদিগকে দাসত্বের নূতন নিগড় পরাইয়া যান।

ভানু সিংহ। (সোৎসাহে) ঠাকুরজি, ঠাকুরজি, আপনি জ্ঞানী, পণ্ডিত, দেশের শান্তিকামী, প্রকৃত দেশহিতৈষীর ন্যায় কথা বলিয়াছেন। আপনি যে আর মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন না ইঁহাতে আমি চিরবাধিত হইলাম।

বেণী রায় এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার মুখমণ্ডল চিন্তাভারাক্রান্ত।

ভানু সিংহ আবার কহিতে লাগিলেন, "ঠাকুরজি, আমি আপনাকে বরেন্দ্রভূমের প্রথম ফৌজদার নিযুক্ত করিলাম। ইহা

ছাড়া, বাদশাহের প্রতিনিধিস্বরূপে আমি আপনাকে সহস্র বিঘা জায়গীর দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। ইহা আমাদের সৌহার্দ্দ্যের প্রথম নিদর্শন মনে করিবেন।”

বেণী রায়। সেনাপতি ভানু সিংহ, আমি ফৌজদারি বা জায়গীরের লোভে অস্ত্রত্যাগে সম্মত হই নাই। দেশ যুদ্ধে অসম্মত। তাই মোগলের গতিরোধে ক্ষান্ত হইলাম।

ভানু সিংহ। পণ্ডিতজি, আমি আপনার পদোচিত সম্মান ও আমাদের সৌহার্দ্দ্য দেখাইবার জন্যই পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিয়াছিলাম। এখন দেখিতেছি, আপনি মোগলের নিকট হইতে কিছু লইবেন না। যদি অনুমতি করেন তবে অন্য এক প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি।

বেণী রায়। কি বলুন।

ভানু সিংহ ফৌজদারি ও জায়গীর দিয়া বেণী রায়কে চিরদিনের জন্য করায়ত্ত করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তাহা হইল না দেখিয়া তিনি এই দলের অন্যান্য ব্যক্তিরা আর যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে সে জন্য তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ফৌজের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রকাশ্যে বলিলেন, “আপনার সঙ্গীদিগকে বাদশাহের অধীনে কাজ দিয়া তাহাদের উপজীবিকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলে বোধ হয় কোন আপত্তি করিবেন না।”

বেণী রায়। আমার সঙ্গীরা ইহাতে রাজি হইবে মনে হয় না। তাহাদের উপজীবিকার বন্দোবস্ত আমিই করিতে পারিব। আপনি সে জন্য কিছু ভাবিবেন না। আমার বা আমার লোকদের জন্য কিছু লইতে ইচ্ছা না করিলেও আপনার নিকট আমার এক

বেণী রায়। অনুরোধ আছে। ভাতুড়িয়ার রাজার সহিত আপনি যে সন্ধি করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে করদরাজ বলিয়া স্বীকার করা হয় নাই। সন্ধির সর্ত্তে অনেকগুলি পরগণা তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে, করভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাজা জগৎনারায়ণের তাহাতে বলিবার কিছু নাই। যুদ্ধের নিয়ম অনুসারে বিজেতার সকল প্রস্তাবেই তিনি বাধ্য। কিন্তু করদরাজের সম্মান না পাইলে বরেন্দ্রভূমিতে তাঁহার মানসম্ভ্রম সব যাইবে। আপনি হিন্দু, এই ব্রাহ্মণ রাজার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া আপনি তাঁহাকে ও আমাকে চির উপকৃত করুন।

ভানু সিংহ। ভাতুড়িয়ার রাজা মোগলের বিরুদ্ধে আপনার সহায়তা করিয়াছিলেন ?

বেণী রায়। না। তিনি পাঠানের হইয়া লড়িয়াছিলেন। আমি পাঠানমোগল উভয়েরই বিরোধী।

ভানু সিংহ। আপনার আর কোন অনুরোধ আছে ?

বেণী রায়। না।

ভানু সিংহ। ঠাকুরজির ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

বেণী রায়। আপনার উপকার চিরদিন স্মরণ রহিবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভানু সিংহের সহিত কথোপকথনান্তে বেণী রায় কৈতের চরে ফিরিয়া আসিতেছেন। তাঁহার হৃদয়-সাগর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাঁহার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়া মনে মনে কহিতেছেন, "যাই, আমার সময় হইল। নিয়তির গতিরোধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। যে নিয়তির বলে সাত্ত্বিক বেণী রায়কে রাজসিক মূর্ত্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছিল তাহারই বলে আবার তাহার সাত্ত্বিক রূপ প্রকট হইবার উপায় হইল। মন্দ কি? দুঃখ রহিল, এই অভিশপ্ত দেশে অকালে আমার কার্য্যাবসান হইল, কেহ আমায় চিনিল না, আমি কার্য্যক্ষেত্র পাইলাম না। জনসাধারণ মুন্সী, খাজাঞ্চি, মজুমদার, সরকার হইবার জন্য ব্যস্ত, ভূস্বামীরা রায়, রায়রায়াঁ, চৌধুরী, রায় চৌধুরী হইতে উৎসুক, সকলেই যাচিয়া মান লইবার জন্য ইচ্ছুক। ইহা যুগধর্ম্ম। মোহের দিনে এমনি হয় বটে। কিন্তু স্থির জানি, এই মোহ শারদ-প্রভাতের মেঘাড়ম্বর মাত্র; দুদিনের মোহ দুদিনে কাটিবে, আত্ম-প্রত্যয় আবার জাগিবে। মা আমায় যে কাজ করিতে পাঠাইয়া-ছিলেন তাহা যথাসাধ্য করিয়া গেলাম। এখন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া যাই।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি কৈতের চরে পঁহুছিলেন। তারপর সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া কালী মূর্ত্তির সম্মুখে উপবেশন করিলেন। বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া

মায়ের সন্তান মায়ের পূজায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিলেন। বেলা দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, রাত্রি এক প্রহর, দ্বিপ্রহর অতীত হইল, ভ্রূক্ষেপ নাই। বেণীমাধবের পুরোভাগে কালীর মূর্ত্তি দীপালোকে ঝলসিত। মার অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধীরে ধীরে মণ্ডপ ছাড়িয়া আকাশে মিশিয়া গেল, বেণী মার আকাশময়ী মূর্ত্তি, চন্দ্রসনাথ তারাদলে ঝলমল অপরূপ বিরাট্ মূর্ত্তি দেখিলেন। দেখিয়া চক্ষু মুদিলেন। তখন মণ্ডপ, আকাশ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে; তিনি দেখিলেন, মা হৃদয়ে উজ্জ্বলে মধুরে, ভীমা শান্তারূপে বিরাজমানা. মৃণ্ময়ী চিণ্ময়ী হইয়াছেন। বেণীমাধব ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে কহিলেন, "মা, তোরই ইচ্ছায় গৃহবাসী বনবাসী হইয়াছিল. এখন সে তোরই জন্য গুহাবাসী হইবে।"

অবশেষে কালীমন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বেণী রায় ডাকিলেন, "যুগল," "চণ্ডী !"

তাঁহারা আসিলে বেণী রায় কহিলেন, "আমার কাজ ফুরাইয়াছে। সমস্ত বরেন্দ্রভূমি মোগলকে সম্রাট্ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। আমরা যে উদ্দেশ্যে এই দল পুষ্ট করিয়াছিলাম তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। অত্যাচার উৎপীড়ন এদেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। পরে যে উচ্চ আশায় বুক বাঁধিয়াছিলাম তাহা ফলবতী হওয়া যে অসম্ভব তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে আর মিছামিছি লোকক্ষয় ও শক্তির অপচয় করিয়া কি হইবে? অনেক বুঝিয়া সুঝিয়া তরবারি কোষের ভিতর রাখিয়া দিয়াছি। উহা আর কোষমুক্ত করিব না। এ দল আজ হইতে ছাড়িয়া যাইব। তোমরা

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গোপাল চন্দ্রকে সাঁতোড়ের সিংহাসনে বসাইয়া বেণী রায় কয়েক দিন সম্বন্ধীর বাড়ীতে থাকেন। সেখানে দীর্ঘকাল পরে বিমলার সহিত তাঁহার দেখা হয়। সেই দেখায় শত অতীতের স্মৃতি সহসা তাঁহার হৃদয় অভিভূত করিয়া ফেলে। এত দিন নিরবচ্ছিন্নরূপে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তিনি প্রিয়তমার শোক অনেকটা ভুলিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জয়ার জীবন্ত প্রতিকৃতি বিমলাকে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব শোক আবার উথলিয়া উঠিল। তাঁহার গণ্ড দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। জয়ার সেই বসন্তের বনশ্রীর ন্যায় বিকশিত রূপ, প্রেমের স্নিগ্ধতা ও ত্যাগের পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল চরিত্র, তার পর গোধূলির তারকার ন্যায় ম্লানোজ্জ্বল কান্তি, বিশীর্ণাবয়ব, শ্মশানের মর্ম্মভেদী দৃশ্য প্রভৃতি একে একে সব কথা তাঁহার মনে পড়িল। আর এই মাতৃহীনা বালিকা যে পিতা বর্ত্তমানেও পিতৃহীনা তাহা চিন্তা করিয়া বিমলার দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়া গেল। একবার ইচ্ছা হইল তিনি এই স্নেহের পুত্তলীকে কৈতের চরে লইয়া যান। আবার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন। বিশেষ, এই শেষ বন্ধন ছিন্ন না করিলে তিনি কোথাও যাইতে পারিবেন না। তাঁহার মনে হইতেছিল তাঁহার কার্য্যাবসানের আর অধিক বিলম্ব নাই। বিমলা এখন গৌরী। গৌরীদান করিয়া তিনি যত শীঘ্র সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন সেই ভাল।

সৎপাত্রের অনুসন্ধানে চারিদিকে লোক পাঠান হইল। অনেক ভাল ঘর বর জুটিলেও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের শত্রুতায় সকল সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। বেণী রায় মূর্খ স্বার্থান্ধ ভট্টাচার্য্যগণের যমস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারাই তাঁহার দেশবাসীদিগের গুরু পুরোহিত পরমার্থ পথের সহায় ভাবিয়া তিনি হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। তাই ইঁহাদিগকে প্রকাশ্যে পরপুষ্ট তণ্ডুলরজতলোভী অপূর্ব্ব জীব বলিয়া ব্যঙ্গ ও ভৎ'সনা করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও প্রতিশোধ লইবার জন্য অনেক দিন হইতে সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এখন তাঁহারা বিমলার বিবাহ উপলক্ষে এক কঠোর সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন, "যে ব্যক্তি এই পণ্ডিত ডাকাইতের কন্যাকে বিবাহ করিবে সে শ্রেষ্ঠ কুলীন হইলেও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে এবং তাহার যে দশা হইবে তাহার সহায়তাকারীদেরও সেই দশা হইবে। বেণী রায়ের অব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি। তাহার স্ত্রীকে মুসলমানে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। অতএব তাহার কন্যার বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিতে পারে না।" হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য এই প্রতিপক্ষীয় দলের একজন প্রধান পাণ্ডা হইলেন।

বেণী রায় বড়ই গোলে পড়িলেন। যে সম্বন্ধ আসে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তাহাই ভাঙ্গিয়া দেন দেখিয়া তিনি রাজা গোপাল চন্দ্রের সাহায্যে এক সদ্বংশজাত বিদ্বান্ কুলীনের সহিত বিমলার বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। সঙ্গোপনে লগ্ন পত্র হইয়া গেল। তার পর মহাসমারোহে শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইল। গোপাল চন্দ্র রাজ্যপ্রাপ্তির

ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাও। যুগল, চণ্ডী, আমি তোমাদিগের নিকট চিরবিদায় চাই!"

চণ্ডী। (অশ্রুপূর্ণ লোচনে) দেবতা, আপনি শিখাইয়াছেন, জলের ধর্ম্ম শৈত্য, অগ্নির ধর্ম্ম উত্তাপ, জীবের ধর্ম্ম আত্মচরিতার্থতা, বীরের ধর্ম্ম আর্ত্তরক্ষা। আমাদের ধর্ম্ম কিরূপে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিব? না ঠাকুর, প্রাণে তা সহিবে না। এমন নিষ্ঠুর আদেশ করিবেন না। বড় সাধের এই দল। ইহার সহিত আপনার শত স্মৃতি বিজড়িত। ইহা ভাঙ্গিবেন না।

যুগল। (কাতরকণ্ঠে) প্রাণের ঠাকুর, আপনার কথার অন্যথা হইবে না জানি। কিন্তু কিছুদিন, আর কিছুদিন আমাদিগকে কাজ করিতে দিন। মনে হয়, অনেক কাজ এখনও বাকি আছে।

বেণী রায়। ঢের বাকি। কিন্তু সময় প্রতিকূল, এ জীবনে আর অভীষ্ট কাজ করিবার সময় আসিবে না। যাহা সাধ্যায়ত্ত নহে তাহার জন্য সকল চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। যখন সময় হইবে তখন আমার মত শত বেণী রায়, তোমাদের মত শত যুগল, শত চণ্ডী আবার আসিবে।

ইহা বলিয়া বেণী রায় তাঁহার দলের আর আর লোকদিগকে ডাকাইলেন ও কেন তাঁহার প্রাণের অধিক প্রিয় দল আর রাখিবেন না তাহা স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া বলিলেন। যাহারা চাষবাস বা চাকরি করিতে স্বীকার হইল, তাহাদিগকে তিনি রাজা জগৎ নারায়ণ ও রাজা গোপাল চন্দ্রের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ভাদুড়িয়া ও সাঁতোড়ের রাজারা তাহাদিগকে ইচ্ছানুরূপ সৈন্যের পদ বা জমিজমা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। বেণী রায় উহাদিগের প্রত্যেককে প্রভূত অর্থ দান করিলেন। মোগলের নিকট হইতে কেহ কোনরূপ সাহায্য লইতে স্বীকার হইল না। চণ্ডী ও যুগল বেণী রায়ের সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু বেণী তাহাতে সম্মত হন নাই। এখন তাঁহাদিগকে বহু অর্থ দিবার প্রস্তাব হইলে তাঁহারা কপর্দ্দকও লইতে চাহিলেন না। অনেক পীড়াপীড়ির পর তাঁহারা সাঁতোড় হইতে লব্ধ পুরস্কারের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিলেন। উহার অবশিষ্ট অর্থ দ্বারা পোতাজিয়ায় **"জয়ার মন্দির"** নির্ম্মিত হইল। উহা সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে বেণী রায় লেখাপড়া করিয়া দিলেন। ঐ মন্দিরে দীন দুঃখী অতিথি অভ্যাগতের নিত্য সেবা চলিতে লাগিল। যুগল, চণ্ডী ও বিমলার স্বামীর উপর উহার কার্য্যপরিচালনার ভার রহিল।

কৈতের চরে যে অর্থ অবশিষ্টছিল তাহা দলের সকলের আগ্রহে দীনদুঃখী পালনের জন্য মন্দিরের তহবিলে প্রদত্ত হইল।

ইহার পর বেণী রায় তাঁহার কার্য্য সমাধা করিয়া দল ভাঙ্গিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। সেই হইতে কেহ তাঁহাকে আর দেখিতে পায় নাই। শেষ দেখা দেখিয়াছিল কেবল এক পাগল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বর্ষাস্নাত রৌদ্র উজ্জ্বল কনকাঞ্চলের ন্যায় দীপ্ত। একটা চোখ গেল পাখী "চোখ গেল", "চোখ গেল" বলিয়া শূন্যে উড়িতেছে। নিম্নে ধূ ধূ প্রান্তরে বেণী রায় "সব গেল," "সব গেল" বলিয়া উধাও ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার মনের অশান্তি কিছুতেই মিটিতেছে না, উদ্বেলিত হৃদয়সাগর কোনরূপে শান্ত হইতেছে না।

ধীরে ধীরে রজনীর অন্ধকার চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এমন সময়ে এক পাগল তাঁহাকে দেখিয়া হা হা রবে অট্টহাস্য করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কে?—এ তো কঙ্কাল। সে মরে গেছে। আলো নিভে গেছে। আঁধারে যার উৎপত্তি আঁধারেই তার লয়। সমুদ্রতরঙ্গের সমুদ্রে উৎপত্তি, সমুদ্রেই লয়।—চারিদিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার, তাহাতে সে জ্যোতিঃ, মেঘের ভিতর বিদ্যুৎ। এই তাহার স্ফুরণ, এই নির্ব্বাণ!—যেখানে দিন ছিল না, ছিল কেবল রাত্রি, অনন্ত রাত্রি, ঘোর তমিস্রা, সেখানে সে বিদ্যুৎচমক! বিদ্যুতের মত ক্ষণিক, কিন্তু আগুনের ঝলকা, ক্ষুদ্র হইলেও বহ্নি-বিকাশ। ভস্ম অগ্নিময়, অগ্নিস্ফুলিঙ্গও অগ্নিময়, উভয়ই অগ্নি। যেমন এক জলেরই বাষ্পতরঙ্গাদি রূপ, এক মৃত্তিকারই ঘটকুম্ভাদি রূপ, এক স্বর্ণেরই কুণ্ডলমালাদি রূপ, এক তন্তুরই বস্ত্রোত্তরীয় প্রভৃতি রূপ, তেমনি এক বিশাল সত্ত্বেরই দেবীদাস—বেণী রায় প্রভৃতি রূপ।—অগ্নিহোত্রী তুমি, অগ্নি রক্ষা করিয়া গিয়াছ, তোমার

আহুতি ধূমের আকারে মহাশূন্যে উঠিয়া মেঘরূপে বসুন্ধরাকে শস্যশ্যামলা করিবে। যাও, তোমার সময় হইয়াছে, তুমি যাও! দুঃখ নাই। যুগধর্ম্মে যাহার বিকাশ, যুগধর্ম্মেই তাহার লয়। ইহাই সনাতন ধারা। বরেন্দ্রভূমি পাঠানদিগের নির্য্যাতনে যখন কাতর হইয়াছিল তখন তুমি আসিয়াছিলে। তাহারা কালপ্রভাবে চলিয়া গিয়াছে, তুমিও গেলে। রহিল স্মৃতি। যেখানে আলো নাই, সেখানে আলোর স্মৃতিই প্রধান সম্বল।—যাও তবে বেণী রায়, অনন্তের যাত্রী তুমি, অনন্তের সন্ধানে যাও। আমি পাগল, গাহিয়া যাই।" এই বলিয়া খ্যাপা সাধু গায়িতে লাগিলেন,

"নিবিড় আঁধারে মা, চমকে ও রূপরাশি,
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরিগুহাবাসা!"

সাধকের সঙ্গীত শুনিয়া বেণী রায় অশ্রুমোচন করিলেন। তার পর সহসা কোথায় অদৃশ্য হইলেন। এই ঘটনার পর তাঁহার সহিত আর কাহারও সাক্ষাৎ হয় নাই।

সমাপ্ত।

রাজা দেবীদাস

এণ্টিক কাগজে কুন্তলীন প্রেসে ছাপা,
কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

এই উপন্যাসখানি বাঙ্গালা সাহিত্যে অত্যন্ত উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, "আপনি একটি ভাব দশটি কাটা কাটা উপমা দিয়া বেশ গুছাইয়া বলিতে পারেন। এমন বাঙ্গালায় অল্প লোকেই পারেন। আপনার গ্রন্থখানি একখানি সম্পূর্ণ tragedy. ইহার আরম্ভ, সন্ধিস্থল, পরিণাম, সকলই সুস্পষ্ট।"

"গ্রন্থকারের ভাষার উপর অধিকার করিয়াছে। আমরা দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য উৎসুক রহিলাম।" সভাপতির অভিভাষণ, চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মিলন, ১৩১৯ সাল।

"লেখকের ভাষা সুন্দর, মার্জ্জিত ও সরল। বর্ণনার গুণে উপাখ্যানটিও আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে। অনুগত মাধব দত্ত, তাহার যোগ্যা সহধর্ম্মিণী তারা, রাজা দেবীদাস, দাম্ভিক আমীনা প্রভৃতির চরিত্র বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে।" ভারতী।

"যখন "সোণার বাঙলা" কলঙ্কের কালিমায় ম্লান হয় নাই, হতাশা ও অবসাদে জীর্ণ হইয়া পড়ে নাই, যখন "বাঙালীর ঘরে ঘরে গোলাভরা ধান, বাটিভরা দুধ, আশাভরা হৃদয়, মনভরা উৎসাহ" বাঙলার সেই সময়ের জীবন্তচিত্র—"দেবীদাসে" উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। যখন ধর্ম্মনিষ্ঠ বাঙালী ব্রাহ্মণ, পুত্রের প্রাণবধ

পর্য্যন্ত অবহেলায় উপেক্ষা করিয়া নিজের ধর্ম্মের জন্য অটলভাবে উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতেন, যখন নিম্নশ্রেণীস্থ সামান্য ভৃত্য প্রভুপুত্রের প্রাণরক্ষার জন্য নিজ পুত্রের প্রাণবলি দিতেও ইতস্ততঃ করিত না, যখন পতিব্রতার আদর্শস্থানীয়া বাঙালী রমণী যবনীপ্রণয়মুগ্ধ বিধর্ম্মী স্বামীর কল্যাণের জন্যও সকল দুঃখ, সকল বিপদ, সকল নির্য্যাতন অকাতরে সহ্য করিতেন, যখন জীবনকে তুচ্ছ করিয়া মানের জন্য বাঙালী বীর জলে স্থলে অসিহস্তে অনন্তশয্যায় শয়ন করিতে ভীত হইত না, যখন অনশনক্লিষ্ট প্রজার জন্য জমিদার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া, অভিভাবকের কর্ত্তব্যপালন করিতেন, যখন বুদ্ধিকৌশলে, চতুরতায়, রাজনীতির জ্ঞানে বাঙালী কর্ম্মচারী জগতের বিস্ময়স্থল ছিল, যখন বাঙালীর হস্তে সুদৃঢ় শত্রুবিমর্দ্দন "লাঠি", মনে ক্ষুরধার বুদ্ধি, হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের পুণ্যপ্রস্রবণ, সেই সময়ের পুণ্য কাহিনীতে "দেবীদাস" পরিপূর্ণ!

"দেবীদাসে"—"দেবীদাসের" মত ধর্ম্মনিষ্ঠ প্রজাপালক আদর্শ জমিদারের, "উমার" মত পতিগতপ্রাণা প্রেমপীযূষময়ী দেবী-প্রতিমার, "নারায়ণীর" মত ভগবৎপরায়ণা মাতৃমূর্ত্তির, "তারার" মত বুদ্ধিমতী প্রেমময়ী—তেজোময়ী প্রকৃত "সহধর্ম্মিণীর", "মাধব দত্তের" মত বিচিত্র বুদ্ধিশালী অক্লান্তকর্ম্মা কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারীর, "ভোলানাথের" মত প্রভুগতপ্রাণ ত্যাগশীল আদর্শ ভৃত্যের, "স্বামী দয়ানন্দের" মত ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরোপকারী, কর্ম্মনিষ্ঠ লোকশিক্ষকের, "করিম" ও "সদানন্দ গোস্বামী'র মত প্রেমবিহ্বল ভগবদ্ভক্তের সুমহান্ চিত্র দেখিতে দেখিতে বার বার অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে বলিতে ইচ্ছা করে, হায় কি পাপে বাঙালী মহত্বের এমন অতুলস্বর্গ হইতে নীচতা, স্বার্থপরতা, ভীরুতার এমন অন্ধ নরকে অধঃপতিত হইল!

অবশ্য গ্রন্থকার গ্রন্থমধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন, যে দেশে "দেবীদাস" জন্মিয়াছিলেন, সেই দেশেই স্বদেশদ্রোহী, স্বধর্ম্মবিদ্বেষী, আত্মসুখসর্ব্বস্ব—"ইস্‌মাইলখাঁ"ও জন্মিয়াছিল, যে দেশে নিঃস্বার্থপরতার প্রতিমূর্ত্তি "ভোলা নাপিত" জন্মিয়াছিল, সেই দেশেই স্বজাতিদ্রোহী স্বার্থপর পাপাত্মা "অম্বিকা-চরণের"ও অভাব হয় নাই।

"দেবীদাস" পড়িতে পড়িতে বাঙালীর হতাশমগ্ন অবসন্ন হৃদয়ও ক্ষণেকের জন্য বাঙালীর প্রাচীন গৌরব, মহিমা, বীর্য্য, তেজস্বিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার অপূর্ব্ব চিত্র দেখিতে দেখিতে আশায় ও আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে। মনে হয় বাঙালী চিরদিন হীন ছিল না—হীনতা তাহার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়তি নহে।

"দেবীদাস" সম্পূর্ণ কাল্পনিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। ইহার সহিত ঐতিহাসিক সত্য বিজড়িত। পশ্চিম বঙ্গ ম্লেচ্ছ পদানত হইবার পরেও বরেন্দ্রভূমি বহুদিন আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছিল। "এক টাকিয়ার" জমিদারেরা, রাজা সীতারাম, রাজা কেদার রায়, রাজা দেবীদাস তাহার উদাহরণ। পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন সুন্দর, ভাষা বিশুদ্ধ সুমিষ্ট আবেগময়ী, বর্ণনা মনোহর। গ্রন্থের সর্ব্বত্র প্রবাহিত স্বদেশ প্রীতির অমৃতধারাস্পর্শে সমস্ত গ্রন্থ পবিত্রীকৃত। নানা বিচিত্র ঘটনার নিপুণ সমাবেশে গ্রন্থখানি এমন চিত্তকর্ষক যে একবার ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে, পুস্তক সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে ক্ষান্ত হওয়া দুরূহ।" বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক, ১৩১৯।